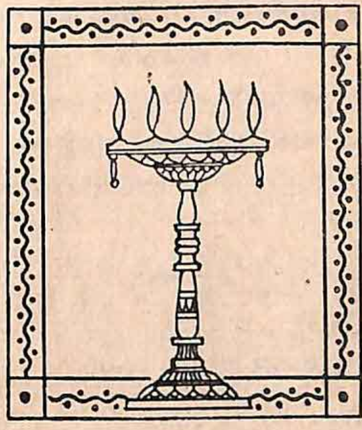

ছোটদের পঞ্চতন্ত্র
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education vide TB No. Syll/BRR/VII/89/1 dated 4-5-1990

ছোটদের

পঞ্চতন্ত্র



শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ওরিয়েন্ট লংম্যান

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস :
৩-৬-২৭২, হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস :
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৩-৬-২৭২, হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪
এস. সি. গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১
'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্ণৌ ২২৬ ০০১

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৬৭
পুনর্মুদ্রণ : মে ১৯৮৭

ISBN 0 00121 027 0

প্রকাশক :
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রাকর :
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

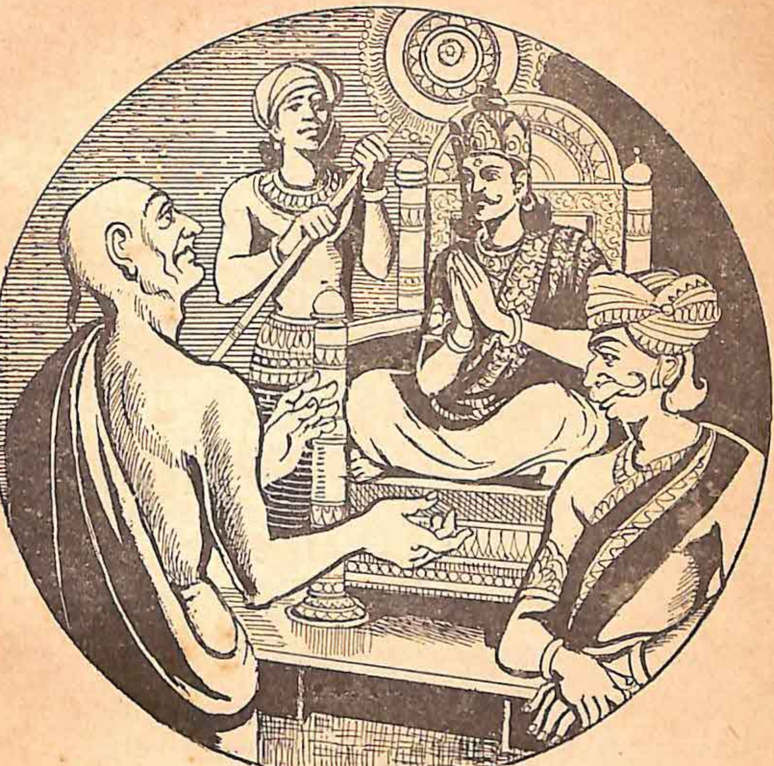
ভূমিকা

গল্পচ্ছলে কোমলমতি বালক-বালিকাদের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্যই আমাদের দেশে হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির সৃষ্টি। এই দু'টি গ্রন্থই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী বিষ্ণুশর্মার রচিত বলে জনপ্রবাদ আছে। বিষ্ণুশর্মা কে ছিলেন ও কোন্ যুগেই বা তিনি এই নীতিমূলক গল্পগুলি ছোটদের জন্য রচনা করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতে মহিলারৌপ্য নগরই বা কোথায় ছিল, তার কোন সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। এই সরল ও সরস নীতি-গল্পগুলি লোকের মুখে মুখে বহুদিন হতেই প্রচলিত হয়ে বিষ্ণুশর্মার নাম শিশু-সাহিত্যে অক্ষয় করে রেখেছে।

গ্রন্থারম্ভেই বলা হয়েছে বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য পাঁচটি তন্ত্র রচনা করে তাদের সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তোলেন। পঞ্চতন্ত্রে 'মিত্রভেদ' ও 'মিত্রপ্রাপ্তির' যে গল্পগুলি আছে, তার অধিকাংশ গল্পই হিতোপদেশে হুবহু একই ভাবে দেখা যায়। মূল গল্পের সাথে শাখা গল্প জুড়ে দেওয়াই ছিল আমাদের দেশের গল্প বলার সুপ্রাচীন রীতি ; রামায়ণে বিশেষ করে মহাভারতে প্রচুর পরিমাণে এ রীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নানা যুক্তি-তর্কের মধ্যে দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে লোকহিতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের গ্রহণীয় বা বর্জনীয় বিষয়ের কথাই এতে বলা হত। পঞ্চতন্ত্রেও সেই প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে।

এই বইটিতে শুধু 'মিত্রভেদ' ও 'মিত্রপ্রাপ্তি'র গল্পগুলি পরিবেশন করলাম। ছোটদের কাছে গল্পগুলি বলতে গিয়ে কোথাও কোথাও এক আধটুকু বাড়াতে কমাতে হয়েছে। এতে মূল গল্পের রস যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। যাদের জন্য গল্পগুলি লেখা তাদের ভাল লাগলেই শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

গ্রন্থকার



সূচনা

দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মহিলারোপ্য নগরীর রাজা অমরশক্তি। রাজার তিন ছেলে — বহুশক্তি, উগ্রশক্তি আর অনন্তশক্তি। ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজার চেষ্টার অন্ত নেই। রাজ্যের সেরা পণ্ডিত সব এলেন তাঁদের বিদ্যাশিক্ষা দিতে, কিন্তু সমস্তই বিফল হল। পণ্ডিতেরা বহু চেষ্টা করেও ছেলেদের বশে আনতে পারলেন না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

ভারি ভাবনায় পড়লেন রাজা অমরশক্তি। ছেলেদের লেখাপড়ার দিকে আদপেই মন নেই, দিনরাত কেবল হৈ হুল্লোড় আর খেলাধুলা নিয়েই মেতে আছে। কারো কথা গ্রাহ্যই করে না। এদের দিয়ে হবে কি ?

বিশ্রামাগারে নীরবে বসে রাজা ভাবছেন। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী এসে দাঁড়ালেন সেখানে। রাজার বিমর্ষভাব দেখে মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজকে বড়ই বিমর্ষ দেখাচ্ছে যে। কি হয়েছে আপনার জানতে পারি কি ?'

রাজার চমক ভেঙে গেল মন্ত্রীর কথায়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'সাধে কি আর এমনভাবে বসে আছি, মন্ত্রী ? আমার ভবিষ্যৎ যে একেবারে অন্ধকার হয়ে আসছে।'

মন্ত্রী রাজার কথায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অন্ধকার হয়ে আসছে, একি কথা বলছেন মহারাজ ? বুঝিয়ে বলুন আপনার কি হয়েছে ?'

রাজা তখন তাঁর মনের দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'ছেলেদের মানুষ করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখছি না মন্ত্রী, কিন্তু সবই যে আমার ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। লেখাপড়ার কথা হলেই যেন তাদের ঘাড়ে ভূত চাপে। অথচ হৈ হল্লার বেলা তারা সবার আগে। যা অবস্থা দেখছি এতে ত এরা একেবারে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকবে। শাস্ত্রে আছে—

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়োদহেৎ ॥

অর্থাৎ অজাত, মৃত ও মূর্খ, এই তিন প্রকার পুত্রের মধ্যে মৃত এবং অজাত পুত্র শ্রেয়। কারণ তারা অল্প দুঃখদায়ক। কিন্তু মূর্খ পুত্র যতদিন জীবিত থাকে ততদিনই যন্ত্রণা দিয়ে দগ্ধ করে। কাজেই আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছাড়া আর কি হতে পারে বল ?'

কিছু সময় একটু ভেবে নিয়ে মন্ত্রী বললেন, 'একটা কথা মনে

পড়ছে, মহারাজ। পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনেরও প্রায় আপনারই মত অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার চেষ্টায় তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। পণ্ডিতের অপূর্ব শিক্ষা-কৌশলে রাজপুত্ররা হয়ে উঠেছে একেবারে নূতন মানুষ। মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে, সেই পণ্ডিতের হাতে রাজকুমারদের শিক্ষার ভার দিলে খুব ভাল হয়।'

অন্ধকারে যেন একটু আলো দেখতে পেলেন রাজা। দুহাতে মন্ত্রীর হাত ধরে বললেন, 'তবে তাই কর মন্ত্রী, যত অর্থ লাগে লাগুক, তুমি পণ্ডিতকে নিয়ে এসো আমার এখানে।'

পরদিনই বিস্তারিত পত্র নিয়ে রাজদূত চলে গেল বিষ্ণুশর্মার কাছে। পত্র পেয়েই পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলেন মহিলারৌপ্য নগরে। বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন বিষ্ণুশর্মাকে দেখে রাজার যা আনন্দ! মহা সম্মানের সাথে তিনি পণ্ডিতকে গ্রহণ করে বললেন তার দুঃখের কথা।

সমস্ত শুনে বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'কোন চিন্তা নেই মহারাজ, আমি কথা দিচ্ছি ছ'মাসের মধ্যেই আপনার পুত্রদের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেব। যদি না পারি ত আমার নামই মিথ্যা।'

খুশি হয়ে রাজা বললেন, 'যদি তাই হয় প্রভু, তবে আপনাকে আমি প্রচুর অর্থ আর ভূসম্পত্তি দিয়ে সম্মানিত করব।'

মৃদু হেসে বিষ্ণুশর্মা বললেন, 'যত গোল ত ঐখানেই, মহারাজ। আমি তো বিদ্যা বিক্রয় করি না। এত বড় একটা রাজবংশের ছেলেরা মূর্খ হয়ে থাকবে? তাই ছুটে এলাম তাদের শিক্ষার ভার নিতে। অর্থ নেব কি করে?'

রাজা বললেন, 'আপনি মহাভাগ। আপনি যথা অভিরুচি ছেলেদের ভার গ্রহণ করুন, আর আমিও নিশ্চিন্ত হই।'

এইভাবে বিষ্ণুশর্মা রাজকুমারদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন, এবং মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, (কাক ও পেঁচা) লব্ধপ্রাণাশ

(ধ্বংস), ও অপরীক্ষিতকারক (যা পরীক্ষা করা হয় নাই) এই পাঁচটি তন্ত্র রচনা করে — গল্পচ্ছলে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

তিনি প্রতিদিন রাজকুমারদের নিয়ে বসতেন তাদের বিশ্রামাগারে। তাঁর সরস কথাবার্তায় রাজকুমার তিনজন অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। ভারি হাসাতে পারেন নূতন পণ্ডিত, আর কথাবার্তাও কি মধুর।

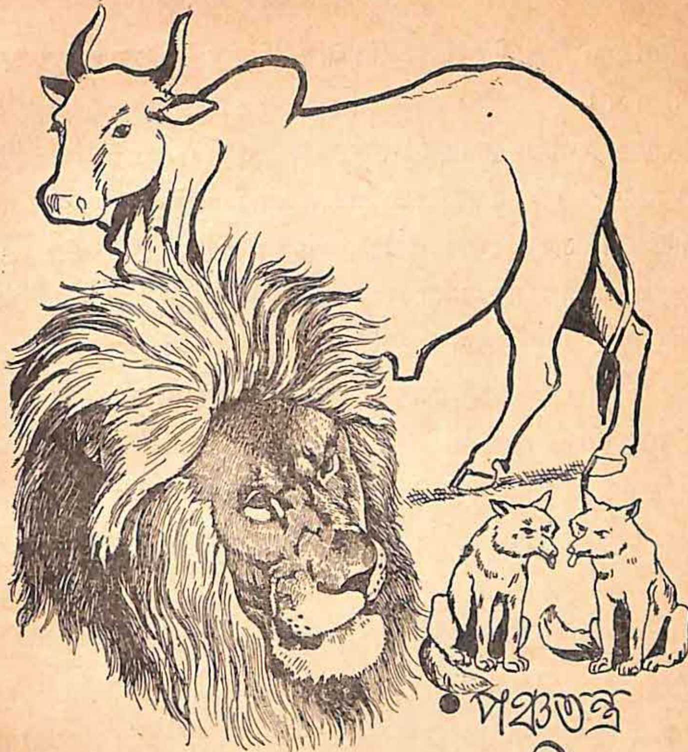
কিছুক্ষণ হাসিখুশির পর বিষ্ণুশর্মা বললেন, ‘আচ্ছা রাজকুমারগণ, কোন্‌টি তোমাদের বেশি ভাল লাগে, গল্প না খেলা ?’

হাসতে হাসতে রাজপুত্রেরা বলল, ‘দুইই সমান ভাল লাগে, গুরুদেব।’

স্মিতহাস্যে পণ্ডিত বললেন, ‘বেশ বেশ, এখন তবে একটু গল্প শোন। পরে খেলতে যেও, কেমন ?’

খুশি মনে তিন ভাই বসে গেল গল্প শুনতে।

বিষ্ণুশর্মা আরম্ভ করলেন—



পঞ্চতন্ত্র

মিত্রভেদ

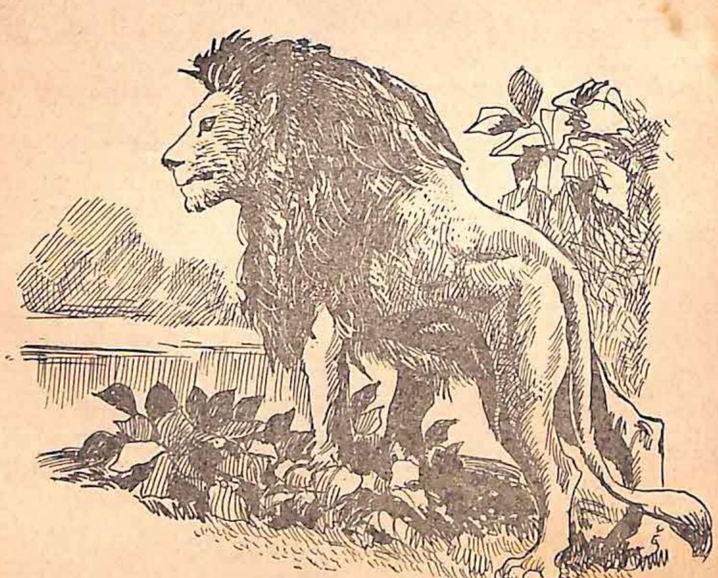
যমুনার তীর জুড়ে গভীর বন। তার পাশ দিয়ে চলেছে এক সার গরুর গাড়ি। মহিলারৌপ্য নগরের বিখ্যাত বণিক বর্ধমানক বাণিজ্যে চলেছেন ঐ সব গাড়ি বোঝাই বেসাতি নিয়ে। নদীর তীর ধরে চলেছে গাড়িগুলো বাঁকের পর বাঁক ঘুরে এঁকে বেঁকে।

হঠাৎ জোর শব্দ হল 'খট্—খট্—খটাং—' পেছনের গাড়িখানার একটা চাকা ভেঙে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি বলদও পড়ে গেছে হুমড়ি খেয়ে। বলদটির একখানা পা একেবারে মচ্‌কে গেছে। বহু চেষ্টা করেও তাকে ওঠানো গেল না। অগত্যা গাড়িখানার

জিনিসপত্র অন্য গাড়িগুলোতে চাপিয়ে দিয়ে বণিক চলে গেলেন তাঁর গন্তব্য পথে।

আহত বলদটি সেখানে পড়ে রইল একা। এইভাবে কাটল দিন তিন-চার। নদীর শীতল বাতাস আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়ে বলদটির পা ক্রমে সেরে উঠল। এখন থেকে সে এই বনেই থাকে ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, আর তাজা ঘাস পাতা খেয়ে সে হয়ে ওঠে এক বিশাল দেহ বলীবর্দ। বিশাল কুঁজ দুলিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় চারিদিকে, আর থেকে থেকে গভীর হুঙ্কারে কাঁপিয়ে তোলে সারা বনভূমি।

একদিন হয়েছে কি, ঐ বনের রাজা পশুরাজ পিঙ্গলক গিয়েছে যমুনায় জল খেতে। হঠাৎ গুরুগম্ভীর শব্দ এল, 'হুঁ—ঙ্কু—র',



ছুটে পালাল পিঙ্গলক সেখান থেকে। জল খাওয়া তার ঘুচে গেছে। ভারি ভয় পেয়েছে পশুরাজ সিংহ। কি ভয়ঙ্কর শব্দ—না জানি

এ কি রকম জানোয়ার—আর তার গায়ে কি দারুণ শক্তি! কাঁপতে কাঁপতে পিঙ্গলক গিয়ে ঢুকল তার গুহার ভিতরে।

গুহা থেকে কিছু দূরে এক ঝোপের ভেতর বসে ছিল দমনক আর করটক, দুই শেয়াল। এরা ছিল পিঙ্গলকের মন্ত্রীর ছেলে। কিন্তু বেয়াড়া ব্যবহারের জন্য সিংহ তাদের দূর করে দিয়েছিল রাজসভা থেকে।

পিঙ্গলকের অবস্থা দেখে দমনক বলল, 'ভাই করটক, রাজার অবস্থা দেখলে ত'? এমন উত্তম সুযোগ সহজে আসে না। এর সদ্ব্যবহার করতে পারলে আবার আমাদের ভাগ্য ফিরে যাবে।'

করটক বলল, 'ভাই দমনক, একটু ভেবেচিন্তে কাজ করাই ভাল। অনর্থক অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে শেষে না সেই ধর্মারণ্যের বানরটার দশায় পড়, সেদিকে খেয়াল রেখো।'

দমনক বলল, 'সে আবার কি?'

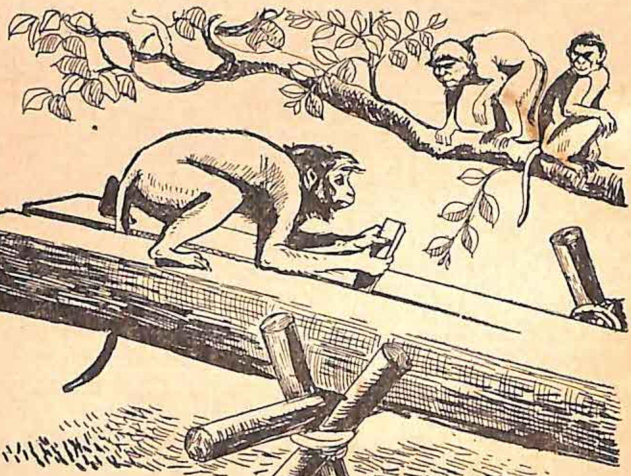
করটক বলল, 'তবে শোন ঃ

অনধিকার চর্চার ফল

কায়স্থ শুভদত্ত ছিলেন মগধের বাসিন্দা। ধর্মারণ্যের কাছে ছিল তাঁর মস্ত বড় বাগানবাড়ি। একবার তাঁর ইচ্ছা হল সেখানে একটি দেবমন্দির তৈরি করবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। দেখতে দেখতে জন-মজুর আর ইঁট কাঠে বাগানবাড়ি ভরে গেল। কোথাও কাঠ চেরাই হচ্ছে, কোথাও মাটি খোঁড়া হচ্ছে। ভোর থেকে কাজ শুরু হয়, আর বেলা শেষে কাজ বন্ধ করে সবাই চলে যায় যে যার ঘরে।

একদিন কাজ বন্ধ করে সবাই চলে গেছে। এমন সময় কোথা থেকে একদল বানর এসে হাজির সেখানে। তাদের কিচির মিচির আর হুটোপাটিতে সারা বাগান সরগরম। ওদের মধ্যে একটা বানর

ছিল ভারি বেয়াড়া। সে দেখল একটা মস্ত বড় গাছের গুড়ি অর্ধেক চেরা হয়ে পড়ে আছে কাঠের ঠেক্‌নার উপর আধা কাৎ হয়ে। দেখেই সে করল কি, এক লাফে গিয়ে চড়ে বসল তার ওপর। আর চেরা ফাঁকটার মধ্যে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে গোঁজটা ধরে টানা-টানি করতে লাগল। তা দেখে অন্য বানররা বলল, "ওখান থেকে সরে এস ভায়া। ও হচ্ছে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, কি থেকে কি হয়ে যাবে কে জানে?" তাদের কথায় বানরটা গেল ভারি চটে, "কি! ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ—আর আমি পারব না—এই ছ্যাখ—" বলেই সে দুহাতে গোঁজটা ধরে মারল টান, "খসা খস্—খসাৎ" গোঁজটা



গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার "ক্রোঁ—ক্রো—কর্‌র্—", বানরটার লেজ আটকে গেছে চেরা কাঠের মধ্যে। তারপর টানাটানি, হেঁচকা হেঁচকি—কিছুতেই কিছু হল না। ক্ষত বিক্ষত হয়ে সে বেঘোরে মারা গেল।'

গল্পটি শেষ করে করটক বলল, 'যার যা কাজ নয়, তা করতে গেলে এমনি ভাবেই বিপদে পড়তে হয়।'

করটকের কথায় দমনক বলল, 'ভাই, তুমি যা বললে তা সত্যি। কিন্তু আমি তো আহাম্মকের মত গায়ের জোর ফলাতে যাব না। বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ হাসিল করব। বসে দেখ না কি করি।' বলেই সে বেরিয়ে গেল ঝোপ থেকে।

গুহার মধ্যে বসে আছে পিঙ্গলক। আশেপাশে তার পাত্রমিত্র সব। কিন্তু কারো মুখে কোন সাড়া নেই। ধীর পায়ে গিয়ে দমনক দাঁড়াল সেখানে। তারপর সিংহকে প্রণাম করে বলল, 'মহারাজের জয় হোক, আশা করি কুশলে আছেন।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিংহ বলল, 'কুশল আর কোথায়, দমনক? এতদিনে বুঝি এখানকার পাততাড়ি গুটাতে হল।'

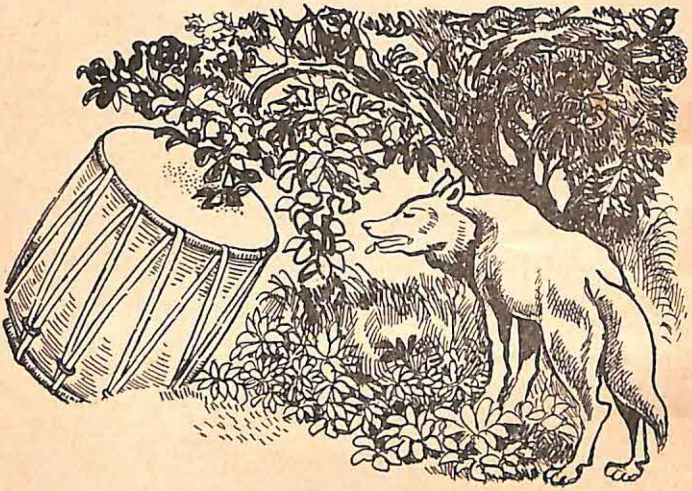
যেন কিছুই জানে না এই ভাব দেখিয়ে দমনক বলল, 'সে কি, হঠাৎ এরকম বলছেন কেন, মহারাজ?'

ভয়চকিত কণ্ঠে সিংহ বলল, 'জান দমনক, এই বনে এক ভীষণ জানোয়ার এসেছে। বজ্রনাদের মত তার ভয়ঙ্কর শব্দে আমার পিলে চমকে গেছে। তাই স্থির করেছি এখানে আর থাকব না।'

মাথা তুলে দমনক বলল, 'মহারাজ, কিছু মনে করবেন না। আমার মতে আপনার এ ইচ্ছা ত্যাগ করাই উচিত। ঐ গর্জনটা কিসের, তার শক্তিই বা কতদূর, তা না জেনে শুনে হুট্ করে একটা কিছু করা ঠিক নয়। কথায় বলে বিপদাপদে ধীর স্থির হয়ে চলতে হয়, না হলে পদে পদে বিড়ম্বনা। একটি গল্প বলছি শুনুন :

"বিন্ধ্য পর্বতের নির্জন বনে বাস করত এক শেয়াল, নাম গোমায়ু। একদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ 'গুম্' 'গুম্' শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। থেকে থেকে কেবল গুম্ গুম্ শব্দ। কখন জোরে, কখনও আস্তে। এ কি তবে ভৌতিক কাণ্ড! বহু চেষ্টা করেও গোমায়ু তার কোন কারণ আন্দাজ করতে পারল না। অগত্যা

স্থির করল এ ভুতুড়ে বন ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল। তারপর আবার ভাবল—না, কি থেকে ঐ শব্দটা হচ্ছে তা না জেনে হঠাৎ চলে যাওয়াটা ভাল হবে না। দেখি না, রাতটা তো আগে ভোর হোক, তখন দেখেশুনে যা হয় করা যাবে। ক্রমে রাত ভোর হয়ে এল। তখনো শব্দ হচ্ছে সেই রকম থেকে থেকে। গোমায়ু চলল সেই শব্দ লক্ষ্য করে বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। কিছুদূর গিয়েই দেখে—ওমা! এ যে একটা প্রকাণ্ড ঢাক পড়ে আছে শেওড়া ঝোপের নিচে।



হাওয়ায় ঝোপটার ডালপালা গিয়ে লাগছে ঢাকটার ছাউনির ওপর আর তাতেই ঐ রকম শব্দ হচ্ছে। গুটি গুটি গিয়ে শেয়াল সেই ঢাকটার ছাউনি ছিঁড়ে ফেলল। তারপর হাসতে হাসতে ফিরে গেল তার বাসায়।"

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'মহারাজ, এইজন্যই বলি, সমস্ত খবরাখবর না জেনে জায়গা ছেড়ে যাবেন না।'

কিছুক্ষণ ভেবে সিংহ বলল, 'তুমি যা বলেছ দমনক, তা মোটেই ফেলবার নয়। তবে কি জান ? যার গর্জন এমন ভয়ঙ্কর, তাকে পরখ করতে যেতে মোটেই সাহস হয় না যে।'

মৃদু হেসে শেয়াল বলল, 'অনর্থক ভয় পাবেন না মহারাজ, যত বড় শক্তিমানই হোক সেই জানোয়ারটা, বুদ্ধির কাছে তাকে হার মানতেই হবে। চাই কি, দরকার হলে তার সঙ্গে আপনার মিত্রতাও করিয়ে দেওয়া যায়।'

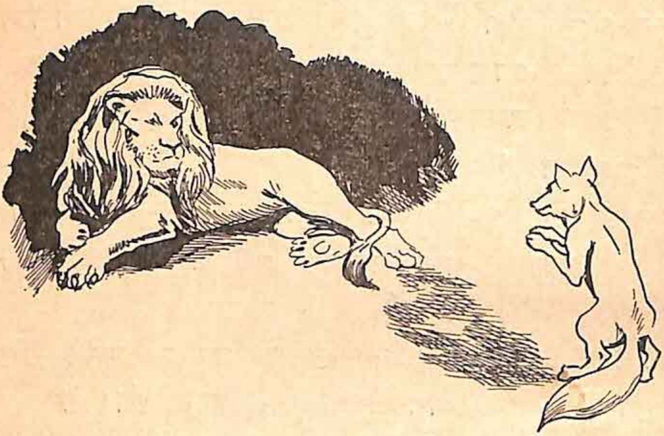
'বেশ, বেশ, এ যদি করতে পার দমনক, আমি তোমাকে মন্ত্রী করে সর্বদা কাছে রাখব।' উৎসাহে উঠে দাঁড়াল পশুরাজ।

রাজাকে প্রণাম করে দমনক বেরিয়ে গেল সেই জন্তুটার খোঁজে। চুপি চুপি চলেছে সে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ খানিক দূরে সেই ভয়ঙ্কর "হু—ক্কু—র্—র্—" শব্দে চমকে উঠল। দমনক কিন্তু হাল ছাড়ল না; পা টিপে টিপে সে এগিয়ে চলল শব্দ লক্ষ্য করে। খানিক এগিয়েই কাশের বন, তারপর এক নাগাড়ে বেশ খানিকটা সবুজ ঘাসের মাঠ। সেখান থেকে শব্দ হচ্ছে 'কচ্ মচ্, কচ্ কচ্'। বেশ বড় একটা জানোয়ার অনবরত ঘাস খেয়ে চলেছে।

গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে দমনক ঢুকল কশাড় বনের মধ্যে। ডালপালার আড়াল থেকে দেখল, একটা বিশাল দেহ বলদ সেই ঘাসের ওপর চরছে। পরম নিশ্চিন্তে সে ঘাস খেয়ে চলেছে ঘুরে ফিরে। চলাফেরার তালে তালে দুলে উঠছে তার প্রকাণ্ড দেহ আর কুঁজ— একবার এদিক, একবার ওদিক।

দেখে শেয়ালের নোলায় জল এসে গেল। কি খাসা চেহারা— চর্বি আর মাংস থল থল করছে সারা দেহে। বার কয়েক ঠোঁটখানা চেটে নিয়ে দমনক ফিরে চলল সেখান থেকে। তারপর সিংহের

সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। তাকে দেখেই পিঙ্গলক বলল, 'কি খবর দমনক, জন্তুটার কোন হদিস পেলে ?'



'পেয়েছি মহারাজ।' বলেই সে গিয়ে বসল সিংহের মুখোমুখি হয়ে। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনি যা ভেবেছিলেন মহারাজ তা সত্যিই। ঐ জন্তুটা হচ্ছে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন নন্দীশ্বরের পুত্র বৃষভেশ্বর। পাহাড়ের মত দেহ—আর তেমনি তার গায়ের জোর। মহাদেবের আদেশেই নাকি সে এই বনে এসেছে।'

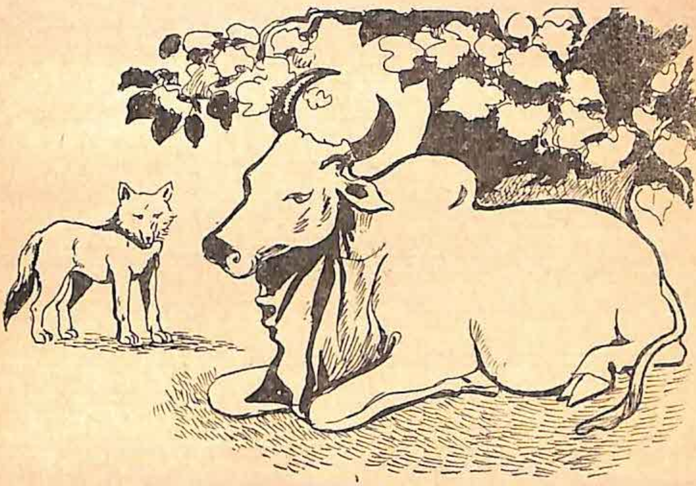
'তাই নাকি, তবে উপায় ?' ভয়ে পিঙ্গলকের মুখ একবারে এতটুকু হয়ে গেল।

সাহস দিয়ে দমনক বলল 'ভয় কি মহারাজ, আমি হচ্ছি আপনার মন্ত্রীপুত্র। আমিই বা কম যাই কিসে ? সোজা উত্তর দিলাম যে এই বনের রাজা হচ্ছেন দেবী ভগবতীর বাহন পশুরাজের পুত্র মহারাজ পিঙ্গলক। তা তুমি যখন বাবার বাহনের ছেলে তখন তো আমাদের আত্মীয় গো। চল না, আমাদের রাজার সঙ্গে একবার

তুমি আলাপ পরিচয় করে আসবে।' কিন্তু বৃষভেশ্বর রাজনীতিতে পাকা। সে বলল, 'রাজার আদেশ নাহলে যাই কি করে? তিনি আদেশ করলেই যাব, এ আর কথা কি?'

ভারি খুশি হল পিঙ্গলক, শেয়ালের কথায়। কেশর ঝাড়া দিয়ে বলল, 'দমনক, আজ থেকে তুমি হলে আমার প্রধান মন্ত্রী। যাও শিগ্‌গির আমাদের বন্ধুকে এখানে নিয়ে এস।'

সিংহের কথায় দমনক এবার সোজা চলে গেল ষাঁড়টির সামনে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'মশাইকে তো কখনো এদিকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। কোথা থেকে এখানে আসা হয়েছে জানতে পারি কি, আর সেই সঙ্গে মশায়ের নামটিও?'



ষাঁড়টা এতক্ষণ একটানা ঘাস খেয়ে নিয়ে ছায়ায় বসে জাবর কাটছিল আনমনে। হঠাৎ প্রশ্ন শুনে সে চেয়ে দেখল একটা শেয়াল দাঁড়িয়ে আছে তার ডান পাশে। গুড়ুৎ করে জাবরকাটা ঘাসগুলো গিলে ফেলে বলল, 'আমার নাম হচ্ছে সঞ্জীবক। আদি

নিবাস ছিল মহিলারৌপ্য নগরে। এখন এখানকারই বাসিন্দা।' শেয়ালের কথার উত্তর দিয়ে সঞ্জীবক জিজ্ঞাসা করল, 'মশায়ের কথার উত্তর ত দিলাম। এখন আপনার নাম আর পরিচয়টা জানতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় জানবেন বৈকি।' শেয়াল এগিয়ে গিয়ে বসল লেজ গুটিয়ে। তারপর বলল, 'আমি হচ্ছি এখানকার রাজা পশুরাজ পিঙ্গলকের মন্ত্রী নাম দমনক। তা আপনি তো দেখছি এখানে একেবারে নূতন। একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। হিংস্র জন্তুর তো অভাব নেই এই বনে। এই ধরুন কেঁদো—চিতা—নেকড়ে—'

ভয়চকিত কণ্ঠে সঞ্জীবক বলল, 'তাই নাকি ? কিন্তু কই, আমি যে-কয়দিন এখানে আছি, তার ভিতরে তো তেমন কোন হিংস্র জন্তুর দেখা মেলেনি। তাই বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলাম এতদিন। এখন দেখছি কোথাও সুখ নেই।'

ঘাড় উঁচু করে দমনক বলল, 'কেন থাকবে না ? তুমি যদি আমার কথা মত চল তাহলে পরম সুখে এখানে থাকতে পারবে। কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।' 'তুমি যা বলবে ভাই আমি তাই করব, তুমি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর।' বলতে বলতে সঞ্জীবক এসে বসল দমনকের পাশে, একেবারে তার গা ঘেঁষে।

দমনক দেখল ওষুধ ধরেছে। সে সঞ্জীবককে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভাই, যখন বন্ধু বলে ডেকেছ, তখন আর তোমার কোন ভয় নেই। চল, এবার আমাদের রাজার সঙ্গেও তোমার বন্ধুতা করিয়ে দিই, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সঞ্জীবক বলল, 'যা ভাল বোঝ কর ভাই, আমি তোমার আশ্রয় নিলাম।'

মৃদু হেসে দমনক বলল, 'দেখ বন্ধু, রাজার সঙ্গে মিত্রতা হলে শেষে এ গরিবকে ভুলে যেও না যেন।'

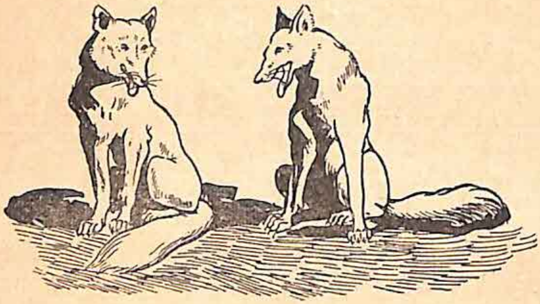
সঞ্জীবক বলল, 'না বন্ধু, তা হয় না। উপকারীকে সঞ্জীবক প্রাণ থাকতে কখনো ভোলে না—ভুলতে পারে না।'

দমনকের চেষ্টায় পিঙ্গলকের সঙ্গে সঞ্জীবকের বন্ধুতা হয়ে গেল। এবং তা ক্রমে এত গাঢ় হয়ে উঠল যে একজন আরেক জনকে মুহূর্ত কালও না দেখে থাকতে পারে না। নিরামিষাশী সঞ্জীবকের পাল্লায় পড়ে সিংহের হিংসাবৃত্তি অনেকটা কমে গেল। দিনান্তে ছোট-খাটো দু'-একটা শিকার ছাড়া কোন কিছুতেই সে আর মন দেয় না। ফলে, তার সঙ্গীদের হল বিষম জ্বালা, আগে বড় বড় শিকার পড়ত—তাতে রাজার সঙ্গে তাদেরও চলে যেত। এখন যা শিকার পড়ে তাতে পিঙ্গলকের নিজেরই সব সময়ে পেট ভরে না, তা সঙ্গীদের ত' কোন কথাই নেই। দেখে-শুনে একদিন করটক দমনককে বলল, 'ভায়া হে, ঐ বোকা বলদটার সঙ্গে তো রাজার খুব ভাব করিয়ে দিলে, এখন বোঝ মজাটা। খিদের জ্বালায় যে সকলের নাড়িসুদ্ধ হজম হতে চলল তার একটা বিহিত কর।'

পিঙ্গলকের পরিবর্তন দমনকেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। কয়েকদিন ধরে সেও ঐ চিন্তাই করছিল। করটকের কথায় সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'এ কয়দিন ধরে আমিও ঐ কথাই ভাবছি রে, ভাই। ঐ মূর্খটার পাল্লায় পড়ে যে রাজার এই অবস্থা হবে তা কে জানত? যাক, ভাবনা করো না। আমিই মিত্রতা ঘটিয়েছি, আবার আমিই তা ভেঙে দেব। যদি না পারি ত আমার নামই মিথ্যা।'

হতাশভাবে করটক বলল, 'দেখ ভাই, বন্ধুতা ঘটানো যত সহজ, ভেঙে দেওয়া তত সহজ বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ সঞ্জীবক হল অতি পণ্ডিত এবং ধীরবুদ্ধি—' বাধা দিয়ে দমনক বলল, 'আর পিঙ্গলক হচ্ছে অত্যন্ত রগচটা ও দারুণ হিংস্র। ঐ কারণেই ওদের

মধ্যে ঝগড়া বাধান খুব সহজ হবে। হাঁ, তবে বুদ্ধি খাটাতে হবে। বুদ্ধির জোরে অমন দারুণ কাল কেউটে পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল একটা কাকের হাতে।'



করটক বলল, 'তা কি করে হল ?'

'তবে শোন,' দমনক বলতে আরম্ভ করল ঃ

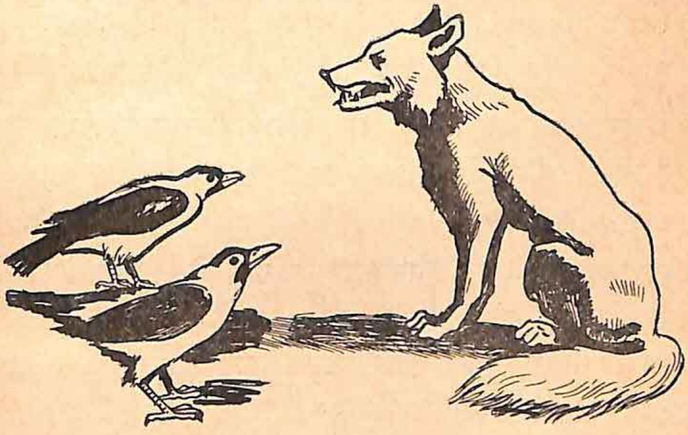
বুদ্ধিই বল

উদ্দণ্ডপুরের রাজধানী ধারানগরী। নগরীর বাইরে রাজার প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির পরে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের উত্তরে বিশাল বন। সেই বনের মধ্যে থাকে এক কাক আর তার বৌ, বটগাছের ডালে বাসা বেঁধে। গাছটার পাশেই ঝোপের ভেতরে এক গর্তে বাস করে এক শেয়াল আর শেয়ালী। দুই পরিবারে ভারি ভাব। সুখে দুঃখে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে বেশ সুখেই আছে। কিছুকাল পর কাক বৌ দুটি ডিম পাড়ল। ডিম ভেঙে যেদিন ছানা বেরুল সেদিন দুই পরিবারের কী আনন্দ! আদর করে ছানা দুটোর নাম রাখা হল 'কালো মানিক'।

ভোর হতেই কাক দুটো বেরিয়ে যায় এদিক ওদিক খাবারের খোঁজে।। আর পোকা, মাকড় যা পায় ধরে এনে খেতে দেয় বাচ্চাদের। এইভাবে দিন যায়।

একদিন হল কি, কাক দুটো বেরিয়ে যেতেই এক মস্ত বড় কাল-কেউটে এসে ঢুকল তাদের বাসায় আর ছানা দুটোকে ধরে নিয়ে গেল গাছের কোটরের ভেতর। তারপর গব্‌গব্‌ করে গিলে ফেলল। দু-দুটো বাচ্চা খেয়ে সাপটার ভারি আলস্য হল। সে করল কি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সেই কোটরের মধ্যে।

কাক দুটো ফিরে এসে দেখে সর্বনাশ—বাচ্চা দুটো কোথাও নেই! খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল তাদের বাসার কাছেই কোটরের মধ্যে এক কাল-কেউটে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে; আর তার আশেপাশে পড়ে আছে বাচ্চাদের ছোট ছোট পালক। কাঁদতে কাঁদতে তারা ছুটে গেল শেয়ালের কাছে। সব শুনে তারও মন ভারি খারাপ হয়ে গেল।



ধরা গলায় শেয়াল বলল, 'নদীর ধারে আর সাপের সঙ্গে বাস করা বড়ই বিপদজনক। যাক, এর একটা বিহিত করতেই হবে।'

চোখের জল ফেলে কাক বলল, 'কি বিহিত করবে ভাই, কেউটে সাপের যা দারুণ বিষ—'

'আরে রেখে দাও তোমার বিষ,' ঝাঁঝিয়ে উঠল শেয়াল।

তারপর বলল, 'শোন ভাই কাক, ওসব গায়ের জোরের কর্ম নয়, যা করতে হয় বুদ্ধির জোরেই করতে হবে। কথায় বলে, "লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু"। অতি লোভের ফলে সাপটার দফা নিকেশ হবেই হবে। তবে বুঝেসুঝে কৌশলে কাজ করতে হবে। শোননি একটা লোভী বক কি ভাবে এক কাঁকড়ার হাতে মারা পড়েছিল!'

কাক বলল, 'না ত', এরকম কাহিনী আমি কোন কালেই শুনিনি।'

শেয়াল বললে, 'তবে শোন ঃ

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

বহুকাল আগের কথা। মধ্যপ্রদেশের এক বনের মধ্যে ছিল এক প্রকাণ্ড ঝিল। সেই ঝিলে ছিল এন্তার ছোট ছোট মাছ আর ছোট বড় শামুক, গুগলি, ব্যাঙ ও কাঁকড়া।

ভোর হতেই সেখানে জড়ো হয় যত রাজ্যের বক, সাদা মেটে, কত রকমের। ঝিলের কিনারা ধরে তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এক পায়ে আর মাছ দেখলেই ধরে নিয়ে দে ছুট। দেখে-শুনে মাছেরা সাবধান হয়ে গেল। পারতপক্ষে তারা আর ঝিলের কিনারা মাড়ায় না।

খাবার পাওয়া কঠিন দেখে বকেরা একে একে চলে গেল সেখান থেকে। কেবল একটা লোভী বক হাল ছাড়ল না। সে করল কি, একদিন দুপুরবেলা ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে। মাছেরা দূর থেকে দেখে, আর পালিয়ে যায় গভীর জলে। বকের কান্না আর থামে না। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। এমন সময় এক কাঁকড়া গুটি গুটি এগিয়ে এল পাড়ের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে সে লক্ষ্য করছে বকটাকে। কথা নেই বার্তা নেই, ও এরকম কাঁদছে কেন?

অল্প জল থেকেই কাঁকড়া বলল, 'ও মামা, হল কি তোমার? চোখের জলে একেবারে ভাসিয়ে দিচ্ছ যে?'

কাঁদতে কাঁদতে বক বলল, 'সাধে কি আর কাঁদছি রে বাপ? বড় খারাপ খবর, তাই চোখের জল সামলাতে পারছি না।'

উদ্বিগ্ন হয়ে কাঁকড়া বলল, 'কি রকম খারাপ খবর, মামা? খুলেই বল না!'

চোখের জল মুছে বক বলল, 'ভাগ্নে, কাল চরতে গিয়েছিলাম ত্রিপর্ণীর মাঠে, নদীর ধারে। সেখানে গিয়ে দেখি নদীর জল ক্রমেই কমে আসছে। বসে বসে ভাবছি এর কারণটা কি, এমন সময় শুনি লোকেরা বলাবলি করছে, এবার থেকে এ অঞ্চলে বার বচ্ছর বৃষ্টি হবে না। নদী, নালা, খাল বিল সব শুকিয়ে কাঠ-ফাটা হয়ে যাবে। লোকজন তো মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে, কি উপায় হবে?'

ভয়চকিত কণ্ঠে কাঁকড়া বলল, 'মামা, তবে আমাদের এটিও'— বাধা দিয়ে বক—কঁ—কঁ করে কেঁদে উঠল, 'একেবারে শুকনো কাঠ হয়ে যাবে রে বাপ—কেউ বাঁচবে না।'

অধীর হয়ে কাঁকড়া বলল, 'তাইতো, বড় ভাবনার কথা, মামা। কি করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? আচ্ছা মামা, তোমার তো বহু দেশ বিদেশ দেখা আছে। আমাদের একটা গতি করতে পার না?'

খানিক চিন্তা করে বক বলল, 'ইচ্ছা থাকলে উপায় মেলে বৈকি ভাগ্নে। আমার কথা মত চললে বেঁচে যেতে পার চিরকালের জন্য।'

কাঁকড়া বলল, 'তাই হবে, মামা। বল কি করতে হবে।'

লম্বা গলা তুলিয়ে বক বলল, 'এখান থেকে এ—ই আট-দশ ক্রোশ দূরে যে নীল পাহাড় আছে—তারই গোড়া থেকে শুরু হয়েছে নীল সায়র "বিশালাক্ষীর দহ", যেন বিরাট সমুদ্দুর! তাল

গাছের মত উঁচু এক-একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের তলায়। অথৈ জল—কূল-কিনারা দেখা যায় না। যদি সেখানে যেতে পার তবে আর কোন চিন্তা নেই। নইলে মৃত্যু নির্ঘাৎ।'

একটানা এতগুলো কথা বলে বকটা চোখ বুঁজে কাঁদতে লাগল কোঁকিয়ে কোঁকিয়ে।

সব শুনে কাঁকড়া বলল, 'তোমার কথা শুনে বাঁচবার আশা হচ্ছে, মামা। কিন্তু এত সব মাছ, ব্যাঙ আর শামুক-গুগ্‌লি, এরা তো উড়তে পারে না, যাবে কি করে? তারপর আমি, আমারও তো একই অবস্থা।'

বিজ্ঞের হাসি হেসে বক বলল, 'সে ভাবনা তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি ঠোঁটে করে নিয়ে সব্বাইকে জলে রেখে আসব। তাহলেই তো হল?'

'তাহলে একটু রসো মামা, আমি ঝিলের সব্বাইকে এই খবরটা দিয়ে আসি।' সুড়ুৎ করে কাঁকড়া গিয়ে জলে ডুব দিল।

ফাঁদে পাখি পড়েছে দেখে বক ভারি খুশি। "ঝটাপট্‌ ঝটাপট্‌" দুবার পাখা ঝেড়ে সে দাঁড়াল সোজা হয়ে। খানিক চুপচাপ। তারপর শুরু হল "ফর্‌র্‌—ফর্‌র্‌—ফুট্‌ ফাট্‌—" ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভেসে উঠল জলের ওপর। একেবারে পাড়ের কাছ বরাবর। উঠেই তারা হৈ চৈ শুরু করে দিল, 'সবই শুনেছি মামা, আমাদের আগে পার করে দাও।'

গম্ভীর ভাবে বক বলল, 'এরকম অস্থির হলে চলবে না বাপ-ধনরা। দেখছ তো আমার এই দুটি মাত্র ঠোঁট, ওতে করে বড় জোর চার কি পাঁচটির বেশি নিতে পারব না। কাজেই ধীরে সুস্থে চলতে হবে।'

মাছেরা তাতেই রাজী হয়ে গেল। সেই থেকে বক রোজ আট-দশবার করে এসে মাছগুলোকে নিয়ে যায় ঠোঁটে করে। এইভাবে

চলল সাত আট দিন। তারপর একদিন কাঁকড়া এসে হাজির, 'এ তোমার কেমন ব্যবহার, মামা? আমি দিলাম সবাইকে খবর আর আমিই বাদ পড়ে গেলাম! ও হচ্ছে না, আজ আমাকে পার করতেই হবে।' ঝুঁটি নেড়ে বক বলল, 'আরে বাবা—ঐ ক্ষুদে মাছগুলোর জ্বালায় কি কিছু করবার যো আছে? একেবারে পাগল করে তুলল যে। নাও, চলে এস, আজ তোমাকেই আগে রেখে আসি।'

জল থেকে উঠে কাঁকড়া বলল, 'আমি তো আর ওদের মত ছোট্টটি নই, মামা। ঠোঁটে করে নিয়ে যেতে পারবে না। পিঠে করে আমাকে নিয়ে যাও না কেন?'

মৃদু হেসে বক বলল, 'কোন বাধা নেই ভাগ্নে, উঠে পড় আমার পিঠে, আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।' তাড়াতাড়ি কাঁকড়া গিয়ে চড়ে বসল বকের পিঠের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বক তাকে নিয়ে উঠল দূর আকাশে। উড়ছে ত উড়ছেই, থামবার নাম নেই। দেখে কাঁকড়া বলল, 'সাগর আর কতদূর, মামা? এ যে দেখছি কেবল পাহাড় আর পাহাড়।'

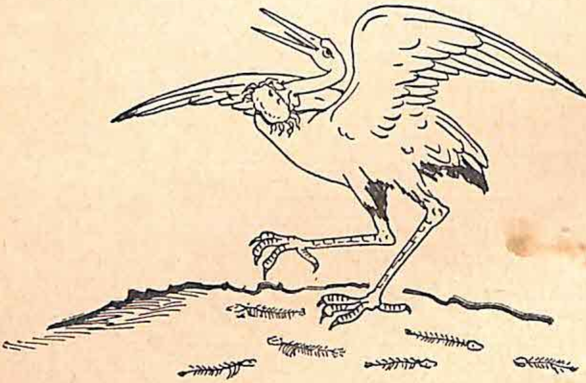
কোন উত্তর দিল না বক, পা দুখানা গুটিয়ে নিয়ে সে সোজা নামতে লাগল নিচে।

উদ্বিগ্ন হয়ে কাঁকড়া বলল, মামা, এখানে জল কোথায় যে নামছ?'

'কিঁক্—কিঁক্—কিঁক্—আছে ভাগ্নে আছে, তোমার মামার এই পেটের মধ্যে। ওখানে গেলেই—হজম হয়ে একেবারে জল—বুঝলে না!'

বলতে বলতে বক গিয়ে নামল এক মস্ত বড় পাথরের উপর। ভয়চকিত চোখে কাঁকড়া দেখল, পাথরখানার ওপর পড়ে আছে অজস্র মাছের কাঁটা আর ভাঙা শামুক গুগ্‌লি।

'ও—রে দুষ্ট—এই বুঝি তোর বিশালাক্ষীর দ'—আকাশ-ছোঁয়া জল ? দাঁড়া, তোর বাঁদরামি বের করছি।' তড় তড় করে কাঁকড়া গিয়ে উঠল বক মামার ঘাড়ের ওপর। তারপর দুই



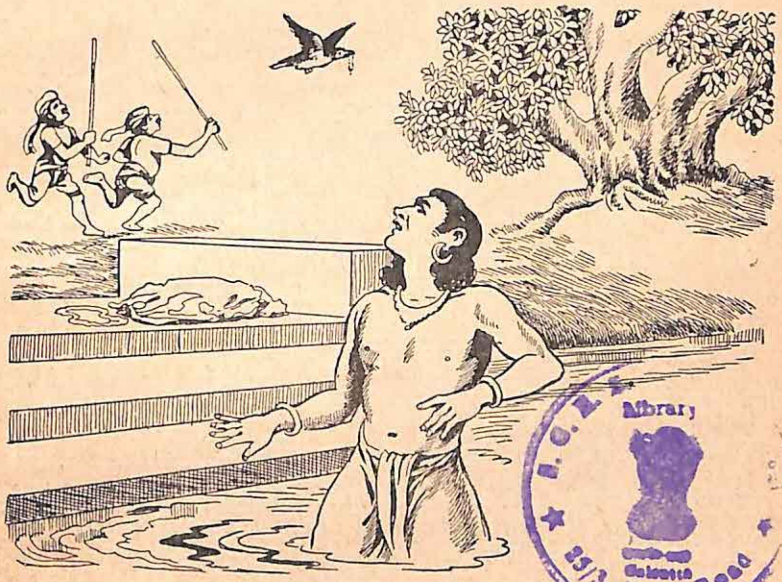
ধারালো দাঁড়া দিয়ে ধরল চেপে তার লম্বা গলাটা। বিষম চাপে মামার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল, চোখ দুটো হয়ে উঠল ছানাবড়া। ছট্‌ফট্ করতে করতে দুষ্ট বক পড়ে গেল সেখানে, আর উঠল না।'

গল্প শেষ করে কাককে শেয়াল বলে দিল কি কৌশলে দুষ্ট সাপটাকে চিরকালের জন্য একেবারে জব্দ করা যাবে।

পরদিন বেলা একটু বাড়তেই শেয়ালের কথা মত কাক আর কাক-বৌ চলল রাজপুরীর দিকে। পুরীর সামনেই প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির পাড়ে এক মস্ত বড় তালগাছ। কাক দুটো গিয়ে বসল সেই গাছটার ওপর। বসে বসে তারা চারিদিক দেখছে, এমন সময় রাজপুত্র চম্পক এলেন দীঘিতে স্নান করতে। সঙ্গে এল তাঁর সাথীরা আর একদল প্রহরী।

এসেই তারা করল কি, তাদের কাপড়-চোপড় আর অলঙ্কারপত্র সব ঘাটের ওপর রেখে সাঁতার কাটতে লাগল জলে নেমে।

কাকটা সেই সুযোগই খুঁজছিল। প্রহরীরা একটু অন্যমনস্ক হতেই হুস্ করে উড়ে এসে রাজপুত্রের হার নিয়ে দে ছুট সেই সাপের কোটরের দিকে। হৈ হৈ করে প্রহরীরাও ছুটল তার পেছনে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে।



কাকটা উড়তে উড়তে সোজা গিয়ে থামল সেই গাছটার মাথার ওপর, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল কোটরের কাছে। সাপটা তখন জেগেই ছিল। কাককে দেখেই সে ফণা তুলে ফোঁস্ করে উঠল। কাকও ছাড়বার পাত্র নয়, এক ঝট্‌কায় হারগাছাটি কোটরের মধ্যে ফেলে দিয়ে বসল গিয়ে পাশের শাল গাছটার ওপর।

প্রহরীরা দেখল সব। তারপর গাছের উপর উঠে সাপটাকে মেরে হারগাছাটি নিয়ে চলে গেল।

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'ভাই করটক, বুদ্ধিমান ব্যক্তি

কোন কাজেই পশ্চাদপদ হয় না। সঞ্জীবক ও পিঙ্গলকের মধ্যে ঝগড়া বাঁধান মোটেই অসম্ভব নয়। তার আর একটি প্রমাণ, ভাসুরক সিংহ আর খরগোশের গল্প শুনলেই আরো ভাল করে বুঝতে পারবে।'

এই কথা বলেই দমনক আরম্ভ করল খরগোশের গল্প ঃ

বুদ্ধিমান খরগোশ

মগধ রাজ্যের উত্তরে ছিল প্রকাণ্ড এক শালবন। ছোট, বড়, নানা-রকমের পশু থাকে সেই বনে। আছে তারা সেখানে বেশ সুখেই। হঠাৎ হল কি—কোথা থেকে এক ভয়ঙ্কর সিংহ এসে হানা দিল সেই বনে। বাছ-বিচার নেই, যাকে পায় তারই ঘাড় মট্‌কায় ধরে ধরে।

ভয়ে সব জন্তু-জানোয়ার একেবারে শুকিয়ে কাঠ। এরকম চললে যে দু'দিনে বন একেবারে পশুশূন্য হয়ে যাবে! ভেবেচিন্তে একদিন সবাই মিলে গেল সিংহের কাছে। এতগুলো জন্তুকে এক সঙ্গে আসতে দেখে সিংহ বলল, 'কি রে, সবাই যে একেবারে দল বেঁধে এসেছিস, লড়্‌বি নাকি আমার সঙ্গে ?'

সকলের আগে ছিল শেয়াল পণ্ডিত। সে জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ ছিঃ—একি কথা বলছেন, মহারাজ ? আমরা আপনার প্রজা। এলাম আমাদের দুঃখের কথা নিবেদন করতে। আর আপনি বলছেন কিনা আমরা লড়াই করতে এসেছি!'

একটু শান্ত হয়ে সিংহ বলল, 'বেশ, কি বলবি বল্।'

জোড় হাতে শেয়াল বলল. 'ধর্মাবতার, আপনি যে ভাবে রোজ পশুদের বধ করছেন, এতে করে দুদিনেই যে বনের পশু সব শেষ হয়ে যাবে। তখন তো আপনিই বিপন্ন হয়ে পড়বেন সবচেয়ে বেশি, তা ভেবে দেখেছেন কি ?'

সিংহ বলল, 'তবে কি আমি না খেয়ে মরব ?' মাথা নত করে শেয়াল বলল, 'বালাই, ষাট ! আপনার শত্রু মরুক। কিন্তু এভাবে পশুবধ করলে যে শেষে আপনাকে সেই দশাতেই পড়তে হবে, তা-ই আমরা বলতে এলাম, মহারাজ।'

কিছুক্ষণ ভেবে সিংহ বলল, 'তাহলে আমি কি করতে পারি বল্ দেখি ?'

শেয়াল বলল, 'আমি বলি কি মহারাজ, আমরা রোজ একটি করে পশু আপনার খাবার জন্য পাঠিয়ে দেব। তাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। তাতে দুদিকেই রক্ষা হবে, আর পশুরাও নিশ্চিন্তি হবে।' সিংহ তাতে রাজী হয়ে বলল, 'বেশ, তাই হবে। কিন্তু যদি কোন দিন এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে আর কাউকে ছেড়ে কথা কইব না—এ আগেই বলে রাখছি।'

পরদিন থেকে সেইরকম শুরু হল। রোজ একটি করে পশু আসে সিংহের কাছে। আর তার মাংস খেয়ে সে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

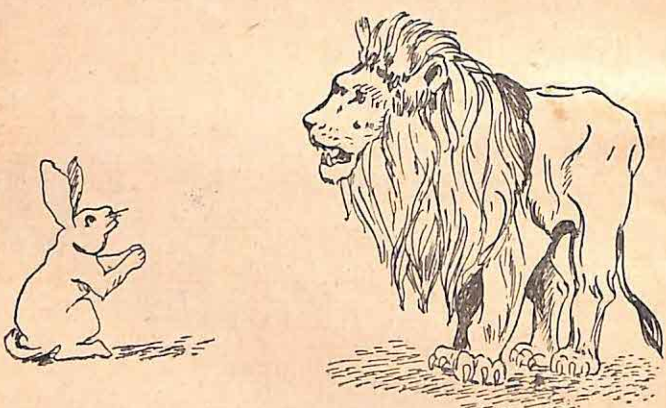
এইভাবে দিন যায়। একদিন হল কি, এক খরগোশের পালা পড়ল সিংহের গুহায় যাবার ; ছোট্ট গোবেচারী, কতটুকুই বা তার মাংস ! সিংহের পেটের এক কোণও ভরবে না ওতে। তবুও যেতে হবে।

ভয়ে ভয়ে চলছে সে ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে। হঠাৎ সামনে পড়ল একটা পাতকুয়ো। কুয়ো দেখেই খরগোশটা গিয়ে উঁকি মারল তার মধ্যে। ভীষণ গভীর কুয়োটা, নিচে জল টল্ টল্ করছে। উঁকি মারতেই তার প্রতিবিম্ব পড়ল সেই জলে। দেখেই হঠাৎ খরগোশের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

সেখানে বসেই সে স্থির করে নিল কি করে দুষ্ট সিংহটার দফা রফা করতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সিংহের গুহার দিকে।

এদিকে বেলা দুপুর পার হয়ে যায়, কিন্তু এখনও খাবার এল না। সিংহ তো রেগে আগুন। আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে ভাসুরক বেরিয়ে এল গুহা থেকে: 'দুষ্টের দল—একটাকেও আজ রেহাই দেব না। সারা বন একেবারে পশুশূন্য করে ছাড়ব, তবে আমার নাম ভাসুরক।' বেরিয়েই দেখল ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ছোট্ট খরগোশ। তার দিকেই আসছে ভয়ে ভয়ে।

হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'এত দেরি কেন রে, বর্বর? আজ তোকেও খাব আর বনসুদ্ধ সব কয়টার ঘাড় মট্‌কাব।'



কাঁপতে কাঁপতে খরগোশ হাত জোড় করে বলল, 'দোহাই মহারাজ, আমাদের কোন দোষ নেই। আমি ত ঠিক সময়েই রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু অর্ধপথে আরেকটা সিংহ এসে আমাকে ধরল। বলে কিনা সে আমাকে খাবে। আমি বললাম, "তা কি করে হবে? আমি যে মহারাজ ভাসুরকের কাছে যাচ্ছি, তিনি হলেন আমাদের রাজা"—বাধা দিয়ে সিংহটা বলল, "কে তোর রাজা ভাসুরক? আমি

তাকে মোটেই গ্রাহ্য করি না"।' 'কি! আমাকে গ্রাহ্য করে না—চল্, কোথায় আছে সেই দুষ্ট? আমাকে দেখাবি, চল্; তারপর বোঝা যাবে কে কাকে গ্রাহ্য করে।' বলতে বলতে ভাসুরক এক লাফে গিয়ে দাঁড়াল পাহাড়ের নিচে।

খরগোশের যা আনন্দ! তাড়াতাড়ি সেও নিচে নেমে আগে আগে চলল সিংহের পথ দেখিয়ে। চলতে চলতে দুজনে গিয়ে উপস্থিত হল সেই কুয়োর কাছে।

কুয়োটার কাছে দাঁড়িয়ে খরগোশ বলল, 'মহারাজ, এখানটাতেই সেই দুষ্টের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এখন গেল কোথায়?' বলেই সে উঠে চড়ে বসল কুয়োর চাতালের উপর। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে বললে, 'যা ভেবেছি তাই হয়েছে। মহারাজ, দুষ্টটা আপনার ভয়ে এসে এর ভেতর লুকিয়ে আছে।'

রাগে গর্ গর্ করতে করতে ভাসুরক গিয়ে দাঁড়াল চাতালের ওপর দুপায়ে ভর দিয়ে। তারপর জলের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ভাবল, সত্যিই বুঝি সেই সিংহটা ভেতরে লুকিয়ে আছে। দেখেই সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'হা—লু—ম্' অমনি তার প্রতিধ্বনি হল 'হা—লু—ম্—' আর যায় কোথায়? গভীর গর্জনে ভাসুরক লাফিয়ে পড়ল কুয়োর মধ্যে। আর উঠতে পারল না। নাকানি চুবানি খেয়ে তলিয়ে গেল গভীর জলে।

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'বুঝলে ভায়া, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করলে কঠিন কঠিন সমস্যারও সহজেই সমাধান হয়ে যায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক করটক, আমি এর একটা সুরাহা করে তবে ছাড়ব।' বলেই দমনক বেরিয়ে গেল সুযোগের সন্ধানে। কিন্তু সুযোগ আর পায় না। পিঙ্গলককে একা পাওয়াই মুস্কিল। সব সময় সে সঞ্জীবকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

ভারি মুশকিলে পড়ল দমনক। কিন্তু হাল ছাড়ল না। শেষে

একদিন হঠাৎ সুযোগ মিলে গেল। সেদিন সঞ্জীবক চলে গেছে দূর বনে চরতে। আর পিঙ্গলক কয়েকজন পার্শ্বচরসহ শুয়ে আরাম করছে গুহার মধ্যে। দেখেই দমনক গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল তার সামনে।

দমনককে দেখে পিঙ্গলক হাই তুলে বলল, 'কি খবর মন্ত্রী, রাজ্যের সব ঠিক আছে তো?'

একটু ইতস্তত করে শেয়াল বলল, 'আর সব ঠিকই আছে মহারাজ, কেবল একটি বিষয়ে একটু গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে বলেই আপনাকে জানাতে এলাম।'

উৎসুক হয়ে সিংহ উঠে বসল, তারপর বলল, 'কি গোলযোগ মন্ত্রী? খুলে বল সব।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে দমনক বলল, 'মহারাজ, কথাটা খুবই গোপনীয়। গোপনীয় কথা কখনো সকলের সামনে বলতে নেই।'

সিংহের ইশারায় পার্শ্বচররা বাইরে চলে গেল। শেয়াল তখন পিঙ্গলকের পাশে বসে বলল, 'মহারাজ, আপনার বন্ধু সঞ্জীবকের কথা বলতে এসেছি।'

'সঞ্জীবকের কথা বলতে এসেছ, কি হয়েছে তার?' অবাক হয়ে তাকাল পিঙ্গলক দমনকের দিকে।

দমনক বললে, 'তার অবশ্য কিছুই হয় নি, হয়েছে আপনার।' 'আমার?' সিংহ কেশর নেড়ে তাকাল। দমনক বলল, 'হ্যাঁ, আপনার। আপনি এখন একটু সাবধানে থাকবেন। সঞ্জীবকের ভাবগতিক আজকাল কেমন যেন ভাল ঠেকছে না। গায়ের জোরে সে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। এমন কি আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, সে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে এই বনের রাজা পর্যন্ত হবার দুরাশা রাখে।' হো হো করে হেসে উঠল পিঙ্গলক, 'তোমার যত উদ্ভট কল্পনা, দমনক। ষাঁড় আবার কবে কোথায় রাজা হতে

শুনেছ ? আমি তাকে ভালরূপেই জানি। তার দ্বারা আমার কোন অনিষ্টই হতে পারে না।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দমনক বলল, 'মহারাজ, পুরুষানুক্রমে আমরা আপনার বংশের মন্ত্রী। আপনার যাতে মঙ্গল হয় তাই আমাদের কাম্য। পুরোনো আত্মীয়কে ছেড়ে নূতনকে বিশ্বাস করবেন না। এতে করে শেষে না সেই শেয়াল চণ্ডরবের মত আপনার অবস্থা হয়, তাই ভেবে আকুল হচ্ছি।'

পিঙ্গলক বলল, 'সে কি রকম ?'

দমনক বললে, 'তবে শুনুন মহারাজ—

নীলবর্ণ শেয়ালের কথা

নিশুতি রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। এই সময় শেয়াল চণ্ডরব খাবার খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হল এক গাঁয়ের ভেতর। কিন্তু সেখানকার কুকুরগুলো ভারি বেয়াড়া; তাকে দেখেই তাড়া করল চারদিক থেকে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটল চণ্ডরব ঝোপ জঙ্গল ভেঙে, খাল নালা ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ছুটতে ছুটতে সামনেই দেখে ধোপা পাড়া। গাঁয়ের যত কুকুর ততক্ষণে এসে তাকে ঘিরে ধরেছে চারদিকে। চণ্ডরব তখন লুকোবার চেষ্টা করল কিন্তু কোথায় লুকোবে ? কাছে-পিঠে ত কোন ঝোপ-ঝাড় নেই। এদিক-ওদিক তাকাতে হঠাৎ পাশেই দেখল একটি বেশ বড় মাটির জালা। দেখেই সে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। জালাটি ছিল জলে ভরা। চণ্ডরব করল কি, জলের মধ্যে সারা দেহ ডুবিয়ে চুপচাপ বসে রইল নাকের ডগাটি ভাসিয়ে।

কুকুরগুলো এসে তাকে আর দেখতে পেল না। খানিক হাঁক-ডাক করে চলে গেল সেখান থেকে। চণ্ডরব কিন্তু জল থেকে উঠল না। কি জানি, আবার যদি কুকুরগুলোর পাল্লায় পড়তে

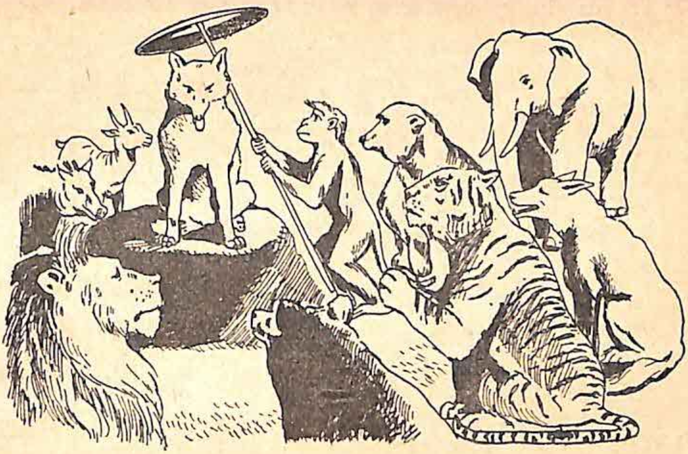
হয়! প্রায় সারা রাত এই ভাবে কাটিয়ে ভোরের কিছু আগে সে চুপি চুপি বেরিয়ে এল জালার ভেতর থেকে। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দে ছুট্—ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির গভীর বনে।

এদিকে হয়েছে কি, সেই জালায় ছিল কাপড়ে দেবার জন্য নীল-গোলা জল। সারা রাত ঐ জলে ডুবে থাকার ফলে চণ্ডরবের গায়ের রং হয়ে উঠল একেবারে গাঢ় নীল। সেদিকে তার মোটেই খেয়াল ছিল না। কিন্তু বনের ভেতর ঢুকেই দেখল, সেখানকার জন্তু-জানোয়ারগুলো কেমন যেন হক্‌চকিয়ে উঠছে তাকে দেখে, ভয়ে ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছে সব। ব্যাপার কি? এরা তো কখনো এরকম করে না। তারপর নজর পড়ল তার নিজের শরীরের ওপর। যা-চ্চলে, এ যে একেবারে নীল রং হয়ে গেছি! তখনি তার মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। সে করল কি, সমস্ত পশুদের ডেকে বলল, "আমি হচ্ছি দেব-পশু কুকুদ্রুম। স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন এই বনের রাজা করে। আমার কথা যে শুনবে না তখনি তার মৃত্যু হবে।"

ভয়ে ভয়ে সব পশুরাই চণ্ডরবের কথায় রাজী হয়ে গেল। সেই থেকে সে বেশ সুখেই আছে। উঁচু টিবির ওপর বসে চণ্ডরব রাজ-কার্য করে। তার সামনে আর দুপাশ ঘিরে নিচে বসে বাঘ, সিংহ, হাতি ইত্যাদি আর সব ছোট বড় আরো নানা রকমের জন্তু-জানোয়ার।

কিছুকাল পর হল কি, চণ্ডরব ভাবল—যত শেয়াল আছে এই বনে, এদের তাড়াতে হবে। নইলে কি জানি যদি কোন দিন সব ফাঁস হয়ে যায়। এই ভেবে সে শেয়ালদের ওপর একেবারে মারমুখো হয়ে উঠল। সভায় তারা এলেই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। এসব দেখে শেয়ালেরা ভারি ঘাবড়ে গেল। কিন্তু এক বুড়ো শেয়াল তাদের সাহস দিয়ে বলল, "এত সহজে হাল ছেড়ো না, বাবারা। শোন, ঐ রাজাটা আসলে

হচ্ছে আমাদেরই স্বজাত। কি জানি কিসে ওর গায়ের রংটা নীল হয়ে গেছে। আর, রাজা হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। যাক যা হবার হয়েছে, এখন আমার কথা যদি শোন তবে ওকে ঢিট্ করতে বেশিক্ষণ লাগবে না।"



শেয়ালেরা একবাক্যে বুড়োর কথায় সায় দিল। বুড়ো তখন চুপি চুপি বলল, "কাল বিকেলে ও যখন সভা করে বসবে তখন খানিক দূর থেকে সকলে এক সঙ্গে ডেকে উঠবে 'হু—ক্কা—হু—য়া'—দেখবে তখন দুষ্টতার কি দুর্গতি হয়।"

তাই হল। পরদিন বেলা পড়ে এলে যেই চণ্ডরব সভা করে বসেছে, অমনি পাশের শটিবন কাঁপিয়ে শেয়ালের দল ডেকে উঠল 'হু—ক্কা—হু—য়া—' আর যায় কোথায়? স্থান কাল ভুলে গিয়ে চণ্ডরবও চিৎকার করে উঠল 'হু—উ—ক্কা—হু—উ—' সমবেত জন্তুরা তো অবাক! একটা ধূর্ত শেয়াল তাদের এতকাল বোকা বানিয়ে এসেছে! "মার্—দুষ্টকে—" হাঁক দিল সব জানোয়াররা।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁদো বাঘ লাফিয়ে পড়ল চণ্ডরবের ঘাড়ে। বাঘের থাবায় তার দফা রফা হয়ে গেল চিরতরে।'

গল্প শেষ করে দমনক বলল, 'তাহলে দেখুন মহারাজ, আপনজনকে অবহেলা করলে কি দুর্দশা হয়।'

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে পিঙ্গলক বলল, 'কিন্তু দমনক, আমার যে কিছুতেই সঞ্জীবককে অবিশ্বাস হচ্ছে না।'

মুখ ভার করে শেয়াল বলল, 'মহারাজ, আমি আপনার মন্ত্রী। যাতে আপনার ও রাজ্যের মঙ্গল হয় সেই রকম মন্ত্রণা দেওয়াই আমার কর্তব্য। সে কাজ আমি করলাম। এখন মহারাজের যা অভিরুচি।'

পিঙ্গলক বলল, 'কিন্তু তার চালচলন ত সে রকম মনে হয় না।'

দমনক বলল, 'এবার দেখবেন সে যখন আসবে, চোখ দুটো তার লাল আর চালচলনে দস্তুরমত লড়াই করবার ভাব। কিন্তু আপনি তাকে কিছুতেই আগে আক্রমণের সুযোগ দেবেন না; দিলে বিপন্ন হতেই হবে।'

দৃঢ়গম্ভীর কণ্ঠে সিংহ বলল, 'আচ্ছা দমনক, তাই হোক। কাল সকালেই এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।'

খুশি মনে দমনক বেরিয়ে পড়ল সঞ্জীবকের সন্ধানে। সঞ্জীবক তখন চরা শেষ করে, জাবর কাটছিল গাছের ছায়ায় বসে। খুঁজে খুঁজে দমনক গেল তার কাছে।

'আরে বন্ধু যে! এস, এস, তারপর খবর কি?' মাথা তুলে তাকাল সঞ্জীবক দমনকের দিকে।

গোমড়া মুখে দমনক গিয়ে বসল সঞ্জীবকের পাশে। তারপর ধরা গলায় বলল, 'খবর বড়ই খারাপ বন্ধু, তোমার সামনে ঘোরতর বিপদ। তাই আগেভাগে সাবধান করতে এলাম।'

ভয়ে ভয়ে সঞ্জীবক বলল, 'কি হয়েছে বন্ধু, কি বিপদের কথা বলতে এসেছ?'

গলার স্বর চেপে দমনক বলল, 'ঐ আমাদের রাজা পিঙ্গলকের কথাই বলছিলাম। বড় লোকের মেজাজ কখন কি ভাবে থাকে বোঝা কঠিন। সকালবেলা আমাকে দেখেই বললেন, "দেখ দমনক, সঞ্জীবকের সঙ্গে আমি একত্র চলাফেরা করি বলে সে নিজেকে কেউ-কেটা বলে মনে করে। আজকাল সে যেন আমাকে গ্রাহ্যই করতে চায় না। মূর্খটাকে তাই একটু ভালরকম শিক্ষা দিতে হবে দেখছি"।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সঞ্জীবক শেয়ালের কথা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'বন্ধু, এরকমটা যে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। শাস্ত্রকাররা সত্যিই বলেছেন যে, মহাসাগরেরও তল পাওয়া যায়, কিন্তু রাজা-মহারাজার মনের তল পাওয়া যায় না কিছুতেই।'

মাথা নেড়ে দমনক বলল, 'অতি সত্য কথা, বন্ধু। রাজা-মহারাজার খেয়ালের কোন মাথা-মুণ্ডু নেই। তাই বলি কি, আগে ভাগেই তুমি পালিয়ে যাও এ বন ছেড়ে। মিছামিছি কি কাজ, ঝগড়া বিবাদের ?'

সঞ্জীবক বললে, 'মৃত্যু যদি ভাগ্যে থাকে বন্ধু, তবে পালিয়ে গেলেই কি রক্ষা পাব ? সিংহের বন্ধু সেই গোবেচারী উটের মতই যে আমার অবস্থা হবে না, তা কে বলতে পারে ?'

দমনক বলল, 'সেই উটেরও কি তোমার দশা হয়েছিল ?'

সঞ্জীবক বলল, 'তবে শোন—

কূটবুদ্ধির ছলনা

ভৃগুকচ্ছের বিশাল অরণ্যে থাকত ভীম-পরাক্রম পশুরাজ মদোৎকট। একটা নেকড়ে আর একটা শেয়াল ও কাক ছিল তার নিত্য সহচর। একদিন একটি উট এসে তার কাছে আশ্রয় চাইল। ঐ যে বলে রাজা-মহারাজের খেয়াল, সিংহ তখনি তাকে নিয়ে নিলে তার দলে।

সেই থেকে তারা আছে সেই বনে বেশ মিলেমিশে। একদিন হল কি, কোথা থেকে এক বিশাল হাতি এসে হানা দিল সেই বনে। ইয়া মোটা মোটা দাঁত আর থামের মত পা দিয়ে সে গাছ পালা ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করতে লাগল। তার নষ্টামি দেখে মদোৎকট তো রেগে আগুন। বজ্র-গর্জনে সে গিয়ে দাঁড়াল হাতিটার সামনে। হাতিটাও কম যায় না, ভীম-গর্জনে সে রুখে দাঁড়াল শুঁড় তুলে। দুজনে লেগে গেল বিষম লড়াই। হার জিত ঠিক করা মুশকিল হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চলল এই ভাবে। তারপর হাতিটা সিংহকে একটু বাগে পেয়ে এমন জোরে মারল এক ঘা যে, সে একেবারে দশ হাত দূরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল এক কাঁটা ঝোপের ওপর। হাতিটার বিশাল দাঁতের ঘা লেগেছে তার ডান পাঁজরের ওপর। নড়তে পারছে না সে। পড়ে রইল মদোৎকট সেখানে কিছুক্ষণ মড়ার মত। তারপর হাতিটা চলে গেলে সে নেমে এল কাঁটা ঝোপটার ওপর থেকে, আর ধুঁকতে ধুঁকতে গিয়ে শুয়ে পড়ল গুহার মধ্যে।

দিন পাঁচ-ছয় বিশ্রাম নেবার পর মদোৎকট সেরে উঠল বটে কিন্তু বড় বড় জন্তু শিকারের ক্ষমতা একেবারে চলে গেল। জোরে ছুটতে গেলে তখন বুকে দারুণ ব্যথা হয়। কাজেই আগের মত আর শিকার পড়ে না। ফলে সিংহের সঙ্গে নেকড়ে আর শেয়ালও থাকে আধপেটা খেয়ে। ক্রমে তিনজনই অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ল। কেবল তৃণভোজী উটের এতে কোন ক্ষতি হল না। সে খেয়ে-দেয়ে দিন দিন বেশ মোটা হতে লাগল। এইভাবে চলল কিছু দিন। তারপর একদিন উট বেরিয়ে যেতেই নেকড়ে, শেয়াল আর কাক বসে যুক্তি আঁটতে লাগল কি করে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

নেকড়ে চোখ বুজে বলল, "তোমরা যাই বল না কেন, আমার

কিন্তু মনে হয় ঐ উটের মাংস খেয়েই আপাততঃ সকলের প্রাণরক্ষা করতে হবে।”

শেয়াল বলল, “মনে মনে আমিও তাই ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু রাজা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, এমতাবস্থায় তার অনিষ্ট করে কার সাধ্য ?”

কাক বলল, “আরে রেখে দাও তোমার আশ্রয়। বলে ‘আপনি বাঁচলে বাপের নাম’। রাজাকে গিয়ে বুঝিয়ে বল তোমাদের কথা তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”

তিনজনে মিলে তখন গেল সিংহের কাছে। সিংহ তখন গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঝিমুচ্ছে চোখ বুজে। ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছে মদোৎকট। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। গুহায় ঢুকেই তিনজনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে চমকে উঠল মদোৎকট। চোখ মেলে দেখল ব্যাপারখানা। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, “কি হয়েছে গো তোমাদের, এত কান্নাকাটি করছ কেন ?”

দুপায়ে চোখের জল মুছে শেয়াল বলল, “সাধে কি আর কাঁদছি, মহারাজ! আপনার অবস্থা দেখে যে সকলের বুক ফেটে যাচ্ছে।”

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সিংহ বলল, “কি করব, বন্ধু ? সবই আমাদের অদৃষ্ট। নইলে এ রকম হবে কেন ?”

তখন শেয়াল বলল, “আমাদের মধ্যে বন্ধু উটই বেশ ভাল আছে। ঘাস পাতার তো অভাব নেই। তাই খেয়ে-দেয়ে বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা হচ্ছে দিন দিন।”

শেয়ালের কথায় সিংহ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল; তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “তা যা বলেছ। ও তো আমাদের মত মাংসাশী নয়, কাজেই ওর ভাবনা কি ?”

সিংহের ভাব দেখে শেয়াল বলল, “মহারাজ, এভাবে চললে তো কেউ বাঁচব না। কাজেই যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।”

হাই তুলে সিংহ বলল, "কি তোমার কথা নির্ভয়ে বল।"

একটু আমতা আমতা করে শেয়াল বলল, "আমি বলি কি, আপাততঃ ঐ উটের মাংস খেয়েই সকলের প্রাণ বাঁচান যাক। তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিংহ বলল, "কিন্তু সে যে আমার ওপর বিশ্বাস করে আশ্রয় নিয়েছে। এ অবস্থায় আমার দ্বারা তার কোন ক্ষতি করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। এতে যা হয় হোক।"

শেয়াল বলল, "আপনি কেন ওতে জড়িত হতে যাবেন, মহারাজ? আমরা এমন কায়দা করব যাতে ও নিজেই আত্মত্যাগ করতে বাধ্য হবে। আর আপনারও প্রাণ রক্ষা হবে।"

চোখ দুটো বুজে সিংহ বলল, "যা ভাল বোঝ কর বাপু, মোদ্দা কথা, আমাকে ওতে জড়িও না।"

আদেশ পেয়ে তিনজন চলে গেল সেখান থেকে, তারপর বহু যুক্তি পরামর্শ করে বিকালে আবার এসে বসল গুহার সামনে। এই সময়ে দেখা গেল উটটি ফিরে আসছে হেলে দুলে। তিন বন্ধুর চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। উট ততক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। উটকে দেখেই কাক বলল, "বন্ধু, দেখছ আমাদের রাজার কি অবস্থা হয়েছে। ভাল করে একটু কথাবার্তাও বলতে পারেন না, চলা ফেরা তো দূরের কথা।"

বেদনা মিশ্রিত কণ্ঠে উট বলল, "সবই তো দেখছি বন্ধু, কিন্তু উপায় কি?"

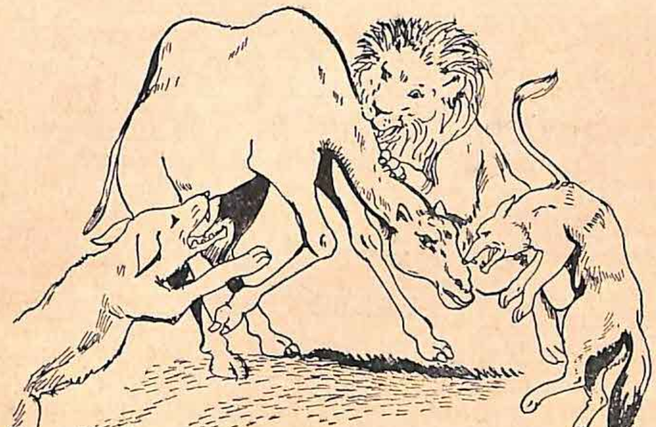
কাক তখন সিংহের কাছে গিয়ে বলল, "কথায় বলে রাজার জন্য আর ধর্মের জন্য দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত দেওয়া উচিত। মহারাজ, আপনি আমার মাংস খেয়ে প্রাণ রক্ষা করুন।"

মৃদু হেসে সিংহ বলল, "তোমার মাংসে আমার পেটের এক কোণও ভরবে না বন্ধু, অনর্থক তোমায় খেয়ে কি হবে?"

পূর্ব পরামর্শ মত তখন নেকড়ে আর শেয়ালও বলল তাদের মাংস খেয়ে মদোৎকট তার প্রাণ রক্ষা করুক।

তাদের কথায় আপত্তি করে সিংহ বলল, "তোমরাও আমার মত মাংসাশী, কাজেই স্বজাতি। স্বজাতির মাংস খেয়ে বাঁচবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই।"

সরল বুদ্ধি উট দেখল তার আশ্রয়দাতা মদোৎকটের তাহলে প্রাণ রক্ষা হয় না। ভেবেচিন্তে সেও বলল, "মহারাজ, অসময়ে আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আপনি যখন এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, তখন আমার মাংস খেয়েই প্রাণ রক্ষা করুন।"



নেকড়ে ও শেয়াল তো তাই চায়। উটের কথা শেষ হতে না হতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। আর কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উটের মাংস খেতে লাগল পেট ভরে।'

গল্প শেষ করে সঞ্জীবক বলল, 'আমার মনে হয় কোন দুষ্টের পরামর্শে রাজা আমার উপর অনর্থক ক্রুদ্ধ হয়েছেন। যাক, মৃত্যু তো

একদিন হবেই। তবে আর কাপুরুষের মত পালিয়ে যাব কেন? বীরের মত যুদ্ধ করেই প্রাণ ত্যাগ করা ভাল।'

ভারি মুস্কিলে পড়ল দমনক। সে ভেবেছিল সঞ্জীবক তার কথা শুনে পালিয়ে যাবে এ বন ছেড়ে। কিন্তু এ যে একেবারে উল্টো হয়ে গেল। ষাঁড়টার যেমন বিশাল দেহ আর লম্বা লম্বা শিং, শেষে না রাজার দফা নিকেশ করে দেয়! ভেবেচিন্তে দমনক বলল, 'বন্ধু, অনর্থক ঝগড়া বিবাদ করে লাভ কি? নিজের শক্তি না বুঝে যে অন্যের সাথে লড়াই করতে যায় তাকে সমুদ্রের মত তিতির পাখির কাছে নাজেহাল হতে হয়।'

সঞ্জীবক বলল, 'সে আবার কি করে হল?'

দমনক বলল, 'তবে শোন—

সমুদ্রের শিক্ষা-কাহিনী

শ্বেত সাগরের ধারে বালির মধ্যে বাসা বেঁধে থাকত এক তিতির পাখি আর তার বৌ। আছে তারা সেখানে বেশ মনের সুখে। একদিন হল কি, তিতির-বৌ তিতিরকে বলল, "ওগো, শুনছ? আমাকে যে এবার ডিম পাড়তে হবে। একটু নিরাপদ জায়গার বন্দোবস্ত কর।"

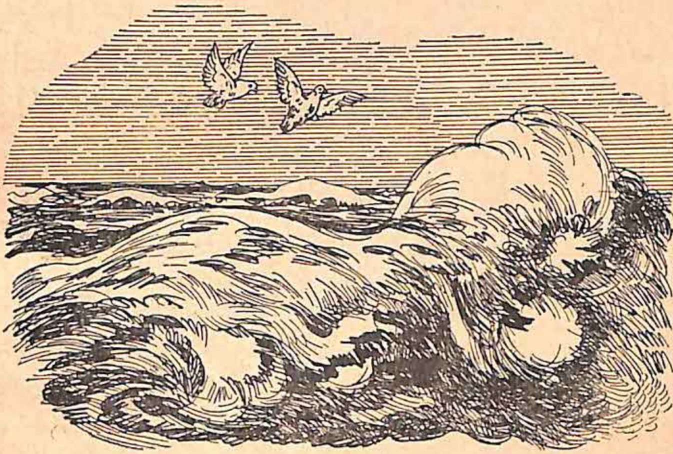
তিতির বলল, "কেন, এ বাসাটা খারাপ কি? এখানেই ডিম পাড় না।"

বৌ বলল, "একেবারে জলের ধারে ডিম পাড়তে সাহস হয় না বাপু। কি জানি কখন ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

চোখ ঘুরিয়ে তিতির বলল, "ইঃ, অমনি নিয়ে গেলেই হল সমুদ্দুরের কি সাধ্য যে আমাদের ডিম ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তুমি নিশ্চিন্তে ডিম পাড়, কোনো ভয় করো না।"

যাক, তিতির-বৌ সেখানেই ডিম পাড়ল। এদিকে হল কি, তিতিরের কথা গেল সাগরের কানে। শুনে সে তো চটে লাল।

"কি—এতটুকু একটা পাখি—তার এত অহঙ্কার! আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজাটা।" বলেই সাগর রেগে একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠল। পাহাড়ের মত এক-একটা ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল তীর ভাসিয়ে। জলের তোড়ে তিতির-বৌয়ের ডিম দুটো ভেসে গেল অথৈ জলে।



দেখে বৌয়ের সে কি কান্না! "আমি আগে থেকেই বলে আসছি সাবধান হতে, কিন্তু আমার কথা তো তুমি শুনলে না। যে হিতৈষী বন্ধুর কথায় কান দেয় না, তার দশা হয় মূর্খ কম্বুগ্রীবের মত।"

তিতির বলল, "কম্বুগ্রাবটা আবার কে?"

তিতির-বৌ বলল, "বলছি, শোন সে কাহিনী—

মূর্খতার ফল

বিন্ধ্য পর্বতের পাশেই বিশাল কসাড় বন। সেই বনের ভেতর আছে এক গভীর জলা। জলার মধ্যে থাকে অজস্র মাছ আর কচ্ছপ কম্বুগ্রীব। কিছুকাল পর সেখানে এল এক জোড়া বুনো রাজহাঁস। জলার কিনারা ধরে ছিল প্রকাণ্ড পদ্মবন। অপর্যাপ্ত মাছ আর

পদ্মের মৃণাল পাওয়া যাবে দেখে হাঁস দুটি সেখানে রয়ে গেল। তাদের দেখে কম্বুগ্রীব ভেসে উঠল জলের ওপর, তারপর আলাপ পরিচয় করে বেশ ভাব জমিয়ে নিল ওদের সাথে। সেই থেকে তারা বহুকাল আছে সেই জলায়।

একদিন হল কি, দুটি লোক এসে দাঁড়াল সেই জলার ধারে, তারপর চারি পারে দেখল সব, আর বলাবলি করতে লাগল, 'দেখেছিস ভাই, এতে এন্তার মাছ আছে। কাল ভোরে সবাইকে নিয়ে এসে এখানে জাল ফেলতে হবে।' বলতে বলতে তারা চলে গেল সেখান থেকে।

হাঁস দুটি তখন পদ্মবনে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। লোক দুটির কথা শুনে তাদের ভারি ভয় হল বন্ধু কম্বুগ্রীবের জন্য। মাছের সাথে ওকেও তো জেলেরা ধরে নিয়ে যাবে। দুটিতে ছুটে গিয়ে বলল কম্বুগ্রীবকে তার বিপদের কথা। শুনে কচ্ছপের প্রাণ কেঁপে উঠল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে হাঁস দুটিকে বলল, 'বন্ধুগণ, তোমরা তো উড়ে পালিয়ে যাবে, কিন্তু আমার উপায়? আমি বাঁচব কি করে বল?'

ভারি ভাবনায় পড়ল হাঁস দুটি, তাই তো—কি করে কি করা যায়—তাদের চুপ করে ভাবতে দেখে কম্বুগ্রীব বলল, 'ভাবছ কি, বন্ধু? শাস্ত্রে আছে বিপদকালে বিজ্ঞ বন্ধুর জন্য যথাসাধ্য করে থাকে। বন্ধু হয়ে তোমরা কি আমাকে এ বিপদে সাহায্য করবে না?'

হাঁসেরা বলল, 'কেন সাহায্য করব না? কিন্তু কি করে তা করা যায় বল? আমাদের মত তুমি তো আর উড়তে পার না, তার উপর আবার চলনও বড় ধীর, কাজেই তোমাকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি, বন্ধু।'

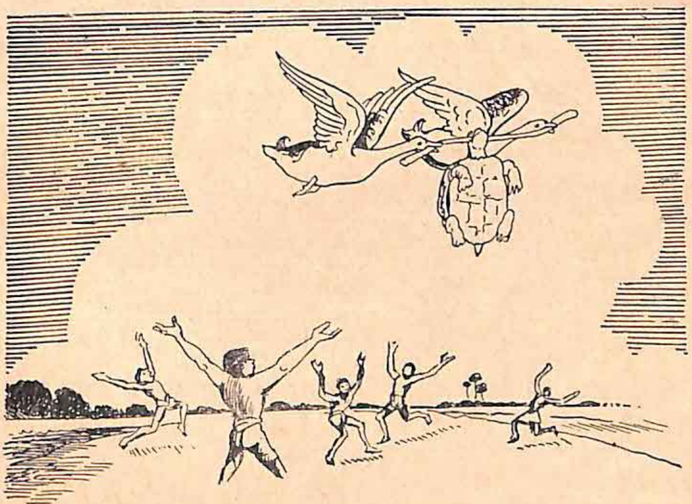
কম্বুগ্রীব বলল, 'ভাবনার কিছুই নেই, বন্ধু। শোন, খুঁজে পেতে কোন স্থান থেকে একটা লম্বা শক্ত কাঠি নিয়ে এস। আমি তার

মাঝখানে কামড়ে ধরে থাকি, আর তোমরা দুজনে কাঠিটার দুদিক কামড়ে ধরে আমাকে নিয়ে উড়ে চলে যাও এখান থেকে।'

হাঁসেরা বলল, 'যুক্তিটা তো বেশ, কিন্তু এতে বিপদও আছে। যদি হঠাৎ তুমি কামড় ছেড়ে দাও তবে আর রক্ষা নেই।'

একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে কম্বুগ্রীব বলল, 'ক্ষেপেছ বন্ধু, আমার প্রাণের মায়া নেই? নাও, আর দেরি করো না। যত শিগগীর এখান থেকে সরে পড়া যায় ততই ভাল।'

কম্বুগ্রীবের কথামত হাঁসেরা তাকে নিয়ে উড়ে চলল আকাশ-পথে। বন ছাড়িয়ে মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে গ্রাম। গ্রামের লোকজন দেখল অবাক কাণ্ড! দুটো হাঁস একটা কচ্ছপকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে



আকাশ দিয়ে। হৈ হৈ করে উঠল তারা। কেউ বলল, 'দেখ, দেখ কলির কাণ্ড—কচ্ছপও একালে আকাশে চলাফেরা আরম্ভ করল।'

আবার কেউ বলল, ‘বেড়ে কচ্ছপটি কিন্তু, হাতে পেলে আরাম করে ওটার মাংস খাওয়া যেত।’ শুনে কম্বুগ্রাব তো রেগে কাঁই। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, “ছা-ই খাও হতচ্ছাড়া।” আর যায় কোথায়! মুখ খুলতেই কম্বুগ্রীব ধপাস্ করে পড়ে গেল নিচে।’

গল্পটি শেষ করে তিতির-বৌ বলল, “এত করে তোমাকে সাবধান হতে বললাম, তবুও তুমি আমার কথায় কান দিলে না, দিলে কি আর ডিমগুলো সাগরের পেটে যেত? আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক যদ্ভবিষ্যের মত।”

তিতির বলল, “সে কি রকম?”

তিতির-বৌ বলল, “তবে শোন।—

এক পুকুরে থাকত তিনটি বেশ বড় বড় মাছ। রুই, কাতলা আর মৃগেল। রুই মাছটার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতি, কাতলের নাম অনাগত বিধাতা আর মৃগেলটার নাম ছিল যদ্ভবিষ্য। তাদের মধ্যে ছিল ভারি ভাব। একদিন কয়েকটা জেলে এসে দেখে গেল পুকুরটা। দেখে শুনে তারা স্থির করল যে পরের দিন ভোরেই এসে সেখানে জাল ফেলবে। অনেক মাছ আছে পুকুরটায়।

মাছ তিনটি শুনতে পেল জেলেদের কথা। এখন উপায়? তিনজনে মিলে বসে গেল পরামর্শ করতে, কি করে প্রাণ বাঁচান যায়।

প্রত্যুৎপন্নমতি বলল, ‘এর আর পরামর্শ কি? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এতে করে এখনি পালাতে হবে এখান থেকে, নইলে উপায় নেই।’

অনাগত বিধাতা বলল, ‘এ বিষয়ে আমিও একমত।’ কিন্তু যদ্ভবিষ্য ভারি বিরক্ত হয়ে বলল, ‘তোরা অত্যন্ত ভীতু। তাই সামান্য কথাতেই ভয় পেয়ে গেছিস। এতকালের বাস—অমনি ছুট্

করে চলে গেলেই হল ? দেখ, যদি আয়ু না থাকে তো পালিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারবি না। লোকে বলে, দৈব সহায় থাকলে অরক্ষিতও রক্ষা পায়, নইলে রক্ষিতেরও নিস্তার নেই।'

অনাগত বিধাতা বলল, 'তুমি একটি আস্ত কুঁড়ে, নড়তে চড়তে তোমার বারোমাস। কাক, কাপুরুষ আর হরিণ জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না। তুমি দেখছি বিপন্ন হবেই হবে!'

রেগে উঠল যদ্ভবিষ্য, 'এত ছট্‌ফট্ করে মরছিস কেন রে ? জেলেরা তো কাল নাও আসতে পারে।'

প্রত্যুৎপন্নমতি বলল, 'আর যদি আসে, তখন কি হবে ?'

মাথা ঢুলিয়ে যদ্ভবিষ্য বলল, 'সে তখন দেখা যাবে। এখন ও নিয়ে অনর্থক হৈ চৈ মোটেই ভাল লাগছে না।'

বিরক্ত হয়ে প্রত্যুৎপন্নমতি আর অনাগত বিধাতা চলে গেল সেখান থেকে। যদ্ভবিষ্য একা পড়ে রইল পুকুরে। পরদিন জেলেরা এসে জাল ফেলল সেই পুকুরে। আর ছোটবড় সব মাছের সঙ্গে যদ্ভবিষ্যকেও ধরে নিয়ে গেল।"

বৌয়ের কথায় তিতির বলল, "দেখ গিন্নী, আমাকে কি সেই বোকা মাছটার মত কুঁড়ে আর মূর্খ পেয়েছ ? ইচ্ছা হচ্ছে কি জান ? দুষ্ট সাগরের সব জল শুষে মেরে দি।"

হেসে উঠল বৌ, "কি আবোল তাবোল বলছ গো! ঐটুকু তো প্রাণী, তুমি আবার সাগর শুষবে! দেখছি তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

তিতির বলল, "তা কেন, কৌশল আর বুদ্ধির বলে কি না হয় ? দেখ না হাতি কত বড় জানোয়ার কিন্তু ঐটুকু মানুষ তাকে কিভাবে কাবু করে রেখেছে। এ তো কৌশল আর বুদ্ধি বলেই।"

বৌ বলল, "তা সত্যি। কিন্তু তুমি তো সেদিক দিয়ে যাচ্ছ না। যদি তা করতে চাও তবে আত্মীয় কুটুম্বদের আগে খবর দিয়ে নিয়ে

এস। ছোট হলেও সবাই একজোট হয়ে কাজ করলে অসম্ভবও অনেক সময়ে সম্ভব হয়ে যায়। একটি গল্প বলছি শোন।" বলেই তিতির-বৌ আরম্ভ করল—

কৌশলী ব্যাঙ

দণ্ডকারণ্যের এক গাছে বাসা বেঁধে থাকে চড়ুই আর তার বৌ। তার পাশেই গাছের ডালে গর্ত করে বাস করে এক কাঠঠোক্‌রা। দুই পরিবারে বেশ ভাব। কিছুকাল পর চড়ুই-বৌয়ের দুটি সুন্দর ডিম হল। দেখে দু পরিবারে যা আনন্দ! এইভাবে দিন যায়। হঠাৎ একদিন হল কি, কোথা থেকে এক বিরাট হাতি এসে দাঁড়াল সেই গাছটার নিচে, আর এলোপাথাড়ি তার ডালপালা ভেঙে তচ্‌ নচ্‌ করতে লাগল। বেগতিক দেখে পাখি দুটো পালিয়ে গেল দূর আকাশে। হাতিটা তখন ডালপালাসুদ্ধ তাদের বাসা ও ডিমগুলো ভেঙে দিয়ে চলে গেল হেলে দুলে।

হাতি চলে যেতেই ছুটে এল পাখি দুটো। এসে দেখে সব শেষ হয়ে গেছে। তখন তাদের কি কান্না! কান্না শুনে বেরিয়ে এল কাঠঠোক্‌রা, 'কি হয়েছে গো, এত কান্নাকাটি কিসের?' চড়ুই তখন আগাগোড়া হাতির কাণ্ড সব বলল কাঠঠোক্‌রার কাছে। শুনে তো কাঠঠোক্‌রা রেগে আগুন। ঝুঁটি খাড়া করে সে হাঁক দিল, 'কি— দুষ্ট হাতিটার এত বড় ক্ষমতা যে যা-নয়-তাই করতে লেগেছে! দাঁড়াও, এর একটা বিহিত করতে হবে, নইলে আর চলছে না।'

চোখ মুছে চড়ুই বলল, 'ঐ পাহাড়ের মত জানোয়ার, ওর সঙ্গে কি করে পেরে উঠবে ভাই?'

কাঠঠোক্‌রা বলল, 'হলই বা পাহাড়ের মত জানোয়ার, তা বলে সে যা ইচ্ছা তাই করবে? চল তো একবার বন্ধু মৌমাছির সাথে দেখা করে আসি। দেখি সে কি বলে।' বনের মধ্যিখানে মস্ত বড় এক

বটগাছ, তার মধ্যে চাক বেঁধে বাস করছে অসংখ্য মৌমাছি। সেই চাকেই বন্ধুর বাসা। দুজনে গিয়ে তাকে বলল সমস্ত ঘটনা। সব শুনে মৌমাছি বলল, 'এরকম অত্যাচার মোটেই সহ্য করা উচিত নয়। চল, সবাই মিলে যাই বন্ধু সোনা ব্যাঙের কাছে। ভারি বুদ্ধিমান আমার সোনা ভাই, একটা কিছু সুরাহা সে করবেই করবে।'

বনের ভেতর এক এঁদো জলায় থাকে সোনা ব্যাঙ। সবাই মিলে গেল তার কাছে। তাদের দেখে ব্যাঙ তো ভারি খুশি। পদ্মপাতা বিছিয়ে সে সবাইকে বসতে দিল। পাতার ওপর বসে চড়ুই বলল তার দুঃখের কথা। সব শুনে ব্যাঙ বলল, 'গায়ের জোরে গোঁয়ারটা কিছুই গ্রাহ্য করছে না দেখছি। আর ওকে বাড়তে দেওয়া নয়। যেমন করে হোক ওটাকে মাটি নেওয়াতেই হবে।'

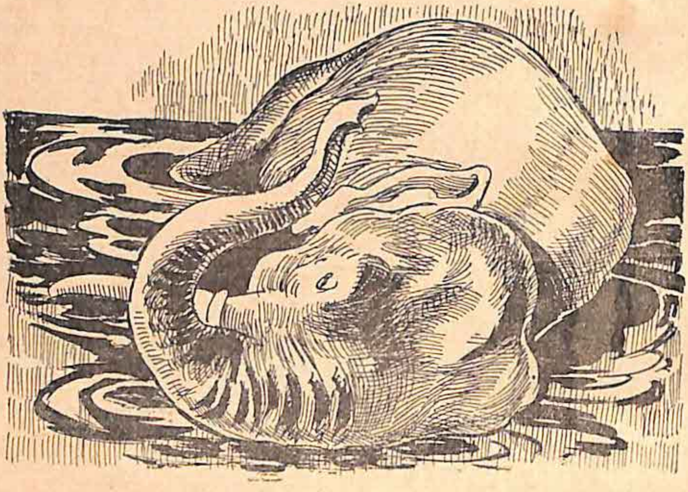
মৌমাছি বলল, 'সে তো আমরাও বুঝি রে ভাই, কিন্তু দুষ্টটার যা গায়ের জোর, তাতে ওর সঙ্গে পেরে উঠবে কে?'

ঠোঁট উল্টে ব্যাঙ বলল, 'আরে রেখে দাও তোমার গায়ের জোর— বুদ্ধি আর একতার কাছে তা কিছুই নয়। শোন, আমি যা বলি সেই রকম কাজ করে যাও দেখি, বাছাধনকে আর টুঁ শব্দটি করতে হবে না।' বলেই ব্যাঙ তাদের কে কি করবে তা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় দিল।

ব্যাঙের কথামত চলল তারা হাতির সন্ধানে। গোঁয়ার হাতিটা তখন ছায়ায় বসে আরাম করছে। দেখেই মৌমাছি করল কি, আস্তে উড়ে গিয়ে বসল হাতিটার ঘাড়ের উপর। তারপর তার কানের কাছে গিয়ে মধুর স্বরে গুন্ গুন্ করতে লাগল।

মিষ্টি সুর শুনে হাতিটার চোখ দুটো বুজে এল খুশির আমেজে। অমনি কাঠঠোক্রা ছুটে গিয়ে তার চোখ দুটো অন্ধ করে দিল ঠোক্কর দিয়ে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হাতি একেবারে লাফিয়ে উঠল, আর পাগলের মত ছুটতে লাগল বনবাদাড় ভেঙে। ছুটতে ছুটতে তার

গলা শুকিয়ে কাঠ—জল চাই। কিন্তু কোথায় জল? চোখে তো সে একেবারেই দেখতে পায় না। অবস্থা বুঝে ব্যাঙ সেই জলা থেকে শব্দ করতে লাগল "ঘ্যাঙর্ ঘ্যাং—কট্, কট্—" শব্দ শুনে হাতিটা ছুটল সেইদিকে, জলের আশায়, আর চোরা কাদায় পড়ে তলিয়ে



গেল।' গল্প শেষ করে বৌ বলল, "কাজেই, যদি কিছু করতে হয় তো তোমাকে সকলের সাথে মিলেমিশেই করতে হবে। একার কর্ম নয় সাগরকে জব্দ করা।"

বৌয়ের কথায় তিতির গিয়ে সমস্ত পাখিদের ডেকে আনল সাগর পারে। বিরাট পক্ষীসভা বসল সেখানে। সভা শেষে সকলে এক সঙ্গে গেল রাজা গরুড় পাখির কাছে। সব শুনে রাজা তাদের অভয় দিয়ে বললেন, "একটু অপেক্ষা কর সকলে, সময়মত আমি এর একটা সুরাহা করবোই।"

সবাই বসে রইল রাজার আদেশের অপেক্ষায়। এমন সময়

বিষ্ণুর দূত এসে উপস্থিত, "পক্ষীরাজ, ভগবান বিষ্ণু একটু বেড়াতে বেরোবেন, চল শিগগীর।"

গরুড় বলল, "প্রভুকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো ভাই আমি আমার প্রজাদের নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছি। এদের একটা কিছু না করে কোথাও এখন বেরোতে পারব না।"

দূত গিয়ে ভগবানকে বলল এই কথা। ভগবান তখন নিজেই চলে এলেন গরুড়ের কাছে। তাঁকে দেখেই গরুড় জোড়হাতে উঠে দাঁড়াল। দেখে ভগবান বললেন, "ব্যাপার কি গরুড়, হঠাৎ তোমার কি হল যে আমার সঙ্গে বেরোতে পারবে না?" গরুড় তখন সাগরের অত্যাচার কাহিনী ভগবানকে বুঝিয়ে বলল ভাল করে।

শুনেই বিষ্ণু আদেশ করলেন সাগরকে, ডিম দুটো ফিরিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সাগর একেবারে চুপ। নড়েও না, চড়েও না।



"কি! দুষ্ট সমুদ্রের এত বড় আস্পর্ধা—আমার কথা শোনে না!" বলতে বলতে তুলে ধরলেন তাঁর সুদর্শন চক্র। গগনবিদারী হুঙ্কারে

গর্জে উঠল মহাচক্র। চারিদিকে ঝরে পড়তে লাগল আগুনের কণা। বিশ্বসংসার যায় আর কি! ভয়ে সাগরের মুখ গেল শুকিয়ে। কাঁপতে কাঁপতে ডিম দুটো ফিরিয়ে দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে ক্ষমা চাইল।

এতগুলি গল্প বলে দমনক বলল, 'ভাই সঞ্জীবক, আমার মনে হয় অনর্থক ঝগড়া লড়াই না করে সরে পড়াই ভাল। শাস্ত্রে আছে যে নিজেকে বাঁচাবার জন্য দরকার হলে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করবে।'

ঘাড় উঁচু করে সঞ্জীবক বলল, 'তা কেন ? কাপুরুষের মত প্রাণভয়ে আমি কিছুতেই পালিয়ে যাব না। আমি সঙ্কল্প করেছি পিঙ্গলকের সাথে লড়াই করবই। আচ্ছা এখন দয়া করে বল তো বন্ধু, সে যে আমাকে আক্রমণ করবে তা কি করে বুঝব ?'

দমনক বলল, 'যখন দেখবে পিঙ্গলক রক্তচক্ষে তোমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে, আর অন্যান্য দিনের মত তোমায় ডেকে কথা বলছে না, তখনি বুঝবে রকম সুবিধার নয়।'

এই কথা বলেই দমনক চলে গেল করটকের কাছে। করটক তখন ঝোপের মধ্যে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। দমনক আসতেই বলল, 'খবর কি ভায়া, ওদিকে কিছু সুবিধে হল ?'

ঠোঁট চেটে দমনক বলল, 'যা করে এসেছি একেবারে মোক্ষম। আরে বাপু চেষ্টা করলে কি না হয়! দৈবের উপর ভার দিয়ে পড়ে থাকলে কিছুই হয় না। কথায় বলে উদ্যোগী পুরুষেরই লক্ষ্মী লাভ হয়। কাপুরুষেরাই দৈব দৈব করে চেঁচিয়ে মরে।'

ধীর গম্ভীর স্বরে করটক বলল, 'ধন্য তোমার উদ্যম! শেষে এর কি ফলাফল হবে বলা অবশ্য শক্ত। তবে তুমি যে কাজ করছ এর ফল ভুগতেই হবে। এবারে না হোক, জন্ম-জন্মান্তরেও তুমি এর হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

বিরক্তিভরে দমনক বলল, 'বিন্দুমাত্র নীতিশাস্ত্র জানা থাকলে

তুমি ওরকম বাজে কথা মোটেই বলতে না ভায়া। শাস্ত্রে বলে, রোগ আর শত্রুকে বাড়তে দিতে নেই। যার জন্য আমাদের খাবার বন্ধ হতে চলেছে, সে তো শত্রু। শত্রুকে নাশ করলে কোন পাপ নেই। কাজেই তোমার কথা আমি মানতে রাজী নই। একটু ভাল করে ভেবে দেখ, এমন সুযোগ কি ছাড়া উচিত? এতে করে খাবার দুঃখ তো ঘুচবেই, তার উপর রাজসভাতেও আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হব।'

ভুরু কুঁচ্কে করটক বলল, 'তোমার ঐ সব কথা আমার মোটেই ভাল লাগছে না, ভায়া। শাস্ত্রে আছে, বিবাদ না করে যিনি সাম দ্বারা কাজ হাসিল করতে পারেন তিনিই প্রকৃত রাজমন্ত্রী হবার যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু তোমাকে তো বলে লাভ নেই। বলতে গেলে সেই দুষ্ট বানরদের হাতে বাবুই পাখির যে দশা হয়েছিল আমারও হয়ত সেই দশাই হবে।'

দমনক বলল, 'সে কি রকম?'

করটক বলল 'তবে শোন—'

তখন ছিল আষাঢ় মাস। ঘোর বর্ষা। দিন নেই রাত নেই কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। গাছপালা সব ভিজে একাকার। নর্মদার তীর ধরে গভীর বন। সেই বনে থাকে এক বাবুই পাখি আর তার বৌ, বিরাট সমী গাছে বাসা বেঁধে। বেশ মজবুত বাসা। একটুও জল ঢুকতে পায় না তার ভেতর।

দুজনে বেশ আরামে কথাবার্তা বলছে বাসায় বসে। হঠাৎ গাছতলায় শব্দ হল 'ঝট্ পট্, ছপ্ ছপ' তারপর সব চুপ। বাবুই মুখ বাড়িয়ে দেখল কয়েকটা বানর ভিজে একশা হয়ে ছুটে এসেছে গাছের তলায়, আর গুঁড়ির সঙ্গে লেগে বসে ঠিঠি করে কাঁপছে দারুণ ঠাণ্ডায়। দেখে বাবুই বলল, 'অনর্থক ভিজে কষ্ট পাচ্ছ কেন, ভাই? তার চেয়ে বাসায় গিয়ে আরাম করাই তো ভাল।'

বাবুইয়ের কথায় বানরদের ভারি রাগ হল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তারা খেঁকিয়ে উঠল, 'কোথাকার আহাম্মক রে তুই! বানরে আবার পাখির মত বাসা বেঁধে থাকে কোন কালে? চুপ করে থাক্, বেশি বকিসনি।'

বাবুইও ছাড়বার পাত্র নয়। চোখ দুটো ঘুরিয়ে সে বলল, 'কি জানি বাপু, মানুষের মত হাত-পা থাকতেও যে নিজের একটা থাকবার জায়গাও করতে জান না, তা বুঝব কেমন করে? এই দেখ না, আমাদের তো মাত্র সরু দুখানি পা আর ছোট্ট দুটি ঠোঁট, এ দিয়েই আমরা কেমন মজবুত বাসা তৈয়ার করেছি। এক ফোঁটা জলও ঢুকতে পায় না এর ভেতরে।'

'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' বাবুইয়ের কথায় বানরেরা আরো চটে গেল। তারপর বৃষ্টি ধরে আসতেই গাছের উপর উঠে বাবুই পাখির বাসাটা ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে দিল। বেচারি পাখি দুটো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। গল্প শেষ করে করকট বলল—'মূর্খকে উপদেশ দিলে তার ফল হয় উল্টো। এছাড়া তুমি তো কেবল মূর্খই নও, দুষ্ট বুদ্ধিতেও তোমার জোড়া মেলা ভার। তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার সেই ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধির কথা মনে পড়ে গেল। দুষ্টামি করতে গিয়ে পাপবুদ্ধির যে দশা হয়েছিল, তোমারও না সেই দশা হয়।'

দমনক বলল, 'বেশ, বল না, পাপবুদ্ধির কি হয়েছিল, শুনি?'

করটক বলল, 'শোন—

ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির কথা

মগধের অন্তর্গত নিশাপুর গ্রামে থাকত সেই ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধি। পাশাপাশি বাড়ি ছিল দুজনের। এরকম কাছাকাছি থাকলেও দুজনের স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মবুদ্ধি ছিল অতি ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ। আর পাপবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত দুষ্ট এবং

কুটিল। ধর্মবুদ্ধির কাছে কিছু টাকা ছিল। পাপবুদ্ধি তা জানত। তাই একদিন সে করল কি, ধর্মবুদ্ধিকে নিরিবিলি ডেকে নিয়ে বলল, 'মিছামিছি টাকাগুলো পড়ে আছে কেন, ভায়া? চল, বিদেশে কোন রকম ব্যবসা করা যাক। এতে যা লাভ হবে, দুজনে ভাগ করে নিয়ে বেশ আরামেই কাল কাটাতে পারা যাবে।'

পাপবুদ্ধির কথায় ধর্মবুদ্ধি রাজী হল এবং সমস্ত টাকা নিয়ে বিদেশে চলে গেল পাপবুদ্ধির সঙ্গে। সেখানে ব্যবসা করে লাভ হল প্রচুর। স্থির হল যে বাড়ি গিয়ে লাভের টাকাটা দুজনে ভাগ করে নেবে। এই স্থির করে দুজনে টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

তার যখন গাঁয়ে এসে পৌঁছল তখন সাঁঝের আঁধার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। পাপবুদ্ধি বলল—'ভাই ধর্মবুদ্ধি, আমাদের সঙ্গে যে এত টাকা আছে তা জানাজানি হলে নানা গোলমালের সম্ভাবনা। তাই আমি বলি কি, ওগুলো এখন বাড়ি না নিয়ে গিয়ে এই বট গাছটার নিচে পুঁতে রেখে যাওয়া যাক। তারপর সুযোগ মত একদিন এসে নিয়ে গেলেই হবে।' সরলপ্রাণ ধর্মবুদ্ধি তাতে রাজী হয়ে গেল এবং বটগাছের নিচে টাকা সব পুঁতে রেখে বাড়ি চলে গেল।

কয়েকদিন পর এক নিশুতি রাতে দুজন গেল সেই গাছের নিচে টাকাগুলো তুলে আনতে। কিন্তু মাটি খুঁড়ে দেখে সর্বনাশ—টাকা-কড়ির নাম-গন্ধও নেই সেখানে। ধর্মবুদ্ধি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। পাপবুদ্ধি কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না। সোজা সে ধর্মবুদ্ধির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলল, 'এ বাপু তোমারই কাজ, নইলে এখানে যে টাকা আছে তা আর কে জানে?' ধর্মবুদ্ধি ধর্মের নামে শপথ করে বলল যে, সে ভুলেও এ কয়দিন এদিক মাড়ায়নি। কিন্তু পাপবুদ্ধি তা মোটেই শুনল না। পরদিন সোজা গিয়ে ধর্মবুদ্ধির

নামে নালিশ জানাল ধর্মাধিকরণে। ধর্মাধ্যক্ষের আদেশে প্রহরীরা গিয়ে ধর্মবুদ্ধিকে ধরে নিয়ে এল। ধর্মাধ্যক্ষের কাছেও ধর্মবুদ্ধি ঐ এক কথাই বলল যে, সে এ বিষয়ে কিছুই জানে না। পাপবুদ্ধি অনর্থক তার নামে দোষ দিচ্ছে।

সব শুনে বিচারক বললেন, 'তোমাদের কোন সাক্ষী আছে কি ?'

ধর্মবুদ্ধি বলল, 'সাক্ষী কোথায় পাব, ধর্মাবতার ? আমার সাক্ষী একমাত্র ধর্ম। যা করবার তিনিই করবেন।'

এই কথায় পাপবুদ্ধি বলল, 'ধর্মাবতার, আমার সাক্ষী স্বয়ং বনদেবতা। আগামী কাল সেই গাছের নিচে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সব গোল মিটে যাবে। এই আমার বিশ্বাস।'

বিচারক বললেন, 'তাই হোক। কাল সকালে সেই গাছের নিচেই তোমাদের বিচার হবে। আজ দুজন বাড়ি যাও।'

বাড়ি ফিরেই পাপবুদ্ধি তার বাবাকে নিরিবিলি ডেকে নিল এক জায়গায়। তারপর সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বলল, 'বাবা, টাকা তো নিয়ে এসেছি, এখন শেষ রক্ষা তোমার উপর নির্ভর করছে।'

বৃদ্ধ বলল, 'আমি এর কি করতে পারি বল ?'

পাপবুদ্ধি বলল, 'আজই শেষ রাত্রে গিয়ে তুমি সেই গাছটার কোটরে লুকিয়ে থাকবে। তারপর ভোরে বিচার আরম্ভ হলে তুমি সেখান থেকে বলবে যে ধর্মবুদ্ধিই টাকা সরিয়েছে।'

তাই হল। পরদিন সবাই গিয়ে দাঁড়াল সেই বটগাছটার নিচে। বিচারকের কথায় পাপবুদ্ধি গাছের উপর তাকিয়ে বলল, 'হে বনদেবতা, আপনি তো সর্বজ্ঞ, সত্য করে বলুন, ঐ টাকা কে সরিয়েছে ?'

সঙ্গে সঙ্গে কোটরের ভেতর থেকে শব্দ হল, 'ধর্মবুদ্ধিই ঐ টাকা চুরি করেছে।' বিচারকের আদেশে প্রহরীরা ছুটে এল ধর্মবুদ্ধিকে

বন্দী করতে। তখন ধর্মবুদ্ধি বলল, 'দোহাই ধর্মবতার! একটু সময় দিন আমাকে, তারপর যা হয় করবেন।' বলেই সে করল কি, একগাদা শুকনো ডাল পাতাতে আগুন ধরিয়ে তা' ফেলে দিল সেই কোটরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত স্বরে 'ওরে—বাবারে—গেছিরে—' চিৎকার করতে করতে পাপবুদ্ধির বাবা লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কোটরের ভেতর থেকে। বৃদ্ধের দাড়ি গোঁফ পুড়ে একাকার। গা-ময় ফোস্কা পড়ে গেছে।



এবার সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। বিচারকের আদেশে প্রহরীরা এসে বন্দী করল পাপবুদ্ধিকে। তখন বিচারক পাপবুদ্ধিকে বললেন, 'পাপবুদ্ধি, তুমি কেবল উপায় চিন্তাই করেছিলে, অপায়ের কথা মনে ছিল না। ভাল-মন্দ বিচার না করে কাজ করেছিলে বলেই তোমার সেই বকের মত অবস্থা হল।'

এই কথা শুনে ধর্মবুদ্ধি বলল, 'বকের কি হয়েছিল ধর্মাবতার?'

বিচারক বললেন, 'তবে শোন—

তখন ছিল শরৎকাল। নীল আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে পেঁজা তুলোর মত সাদা সাদা মেঘ। নদী-নালা সব জলে টৈ-টুম্বুর। চারিদিকে অপূর্ব ফুল আর পাতার বাহার। সেই সময়ে এক বক চলেছিল এক জলার ধার দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে। কয়েকদিন হল তার দুটো বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু একটা কেউটে সাপ এসে সেই বাচ্চা দুটোকে খেয়ে ফেলেছে। তাই বকের মনটা ভারি খারাপ হয়ে আছে। চলতে চলতে এক কাঁকড়ার সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই কাঁকড়া বলল, "আরে ভায়া যে, এভাবে চলেছ কোথায়? মুখখানি বড় ভার ভার দেখাচ্ছে যে, হয়েছে কি?"

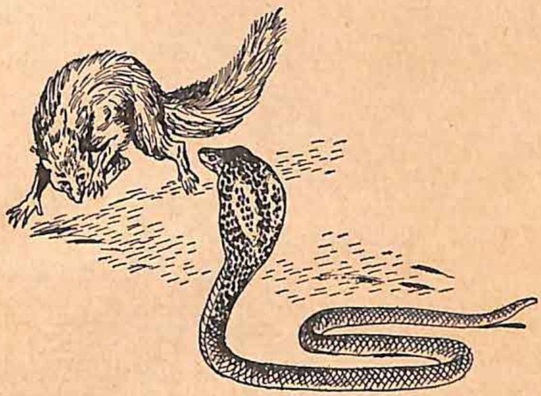
ছল ছল চোখে বক তখন সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বলল, "বড় কষ্টেই দিন কাটছে রে ভাই। দুষ্ট কেউটে সাপটাকে শেষ না করা পর্যন্ত আর সোয়াস্তি পাচ্ছি না।"

কাঁকড়া বলল, "তা ত বটেই। কিন্তু সাপটা থাকে কোথায় তার হদিস পেয়েছ?"

বক বলল, "তা পেয়েছি। আমি যে গাছে বাসা করে আছি সেই গাছটার নিচে এক গর্তের মধ্যে থাকে সেই শয়তানটা।" শুনে কাঁকড়া মনে মনে ভাবল, "আমাদের বাচ্চাগুলো ধরে খাবার বেলাতে একথা মনে হয় না। রসো দেখাচ্ছি মজাটা।" তারপর বককে বলল, "ভেবে-চিন্তে দেখলাম ভাই শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তুমি এক কাজ কর। পাশের ঐ শিমুল বনের মধ্যে যে বেজি থাকে না? তার গর্ত থেকে আরম্ভ করে সেই শয়তানটার গর্ত পর্যন্ত এন্তার ছোট ছোট মাছ ছড়িয়ে রাখ। তাহলেই দেখবে বাছাধনকে আর দস্যিপনা করে বেড়াতে হবে না। মাছের লোভে বেজি এসে ওর দফা রফা করে দেবে।"

কাঁকড়ার কথামত বক তাই করল। মাছ খেতে খেতে বেজি এসে সাপটাকেও মেরে খেয়ে ফেলল। এতেই কিন্তু সব শেষ হল না। যাবার সময় বেজিটা বকের আস্তানা দেখে গেল, আবার তার

ছানা হতেই এসে সেগুলোকে মেরে মুখে করে নিয়ে চলে গেলে তার গর্তে। বক তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হায়—দুর্বুদ্ধি কাঁকড়ার কথায় আমি নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলাম।"



গল্প শেষ করে করটক বলল, 'তুমি তো সেই পাপবুদ্ধির মত কেবল উপায়ই চিন্তা করছ, কিন্তু অপায়ের কথা ভেবে দেখনি ; তার উপর তুমি একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ। শাস্ত্রে আছে মূর্খ বন্ধুর চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও ভাল। তোমার সঙ্গে বন্ধুতা করতে গিয়ে আমার না শেষে বানরের হাতে রাজার দশার মতো হয়।'

দমনক বলল, 'সে কি রকম ?'

করটক বলল, 'তবে শোন—

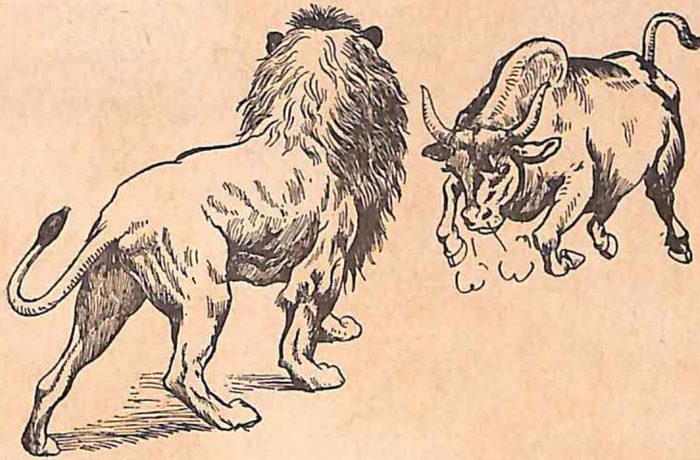
এক দেশের রাজা এক বানর পুষেছিলেন। সে মানুষের মত কথা বলতে পারত না বটে, কিন্তু কাজকর্ম করত ঠিক মানুষেরই মত। সে রাজার এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, সব সময় তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন।

একদিন হয়েছে কি, রাজা দুপুরবেলা ঘুমিয়ে আছেন সোনার খাটে, আর বানরটা তাকে হাওয়া করছে চামর দুলিয়ে। এমন সময় একটা মাছি এসে বসল রাজার মুখের উপর। চামর দুলিয়ে বানর তাকে তাড়িয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পর মাছিটা আবার উড়ে এসে বসল রাজার নাকের উপর। এবারও বানরটা তাই করল। কিন্তু মাছিটা ভারি বেয়াড়া। তাড়িয়ে দিতেই আবার আসে। ভারি চটে গেল বানরটা। তারপর আবার মাছিটা এসে রাজার গায়ে বসতেই সে একখানা তলোয়ার এনে মারল এক ঘা মাছিটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মাছিটার কিছুই হল না। সুড়ুৎ করে সে উড়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। মাঝখান থেকে রাজার শরীর কেটে রক্তগঙ্গা।'

গল্প শেষ করে করটক বলল, 'বুঝলে বুদ্ধিমান, তোমার মত মূর্খের সঙ্গে যে মেলামেশা করবে, তার ভবিষ্যৎ ঐ রকমই হবে।' বলেই করটক দমনককে ছেড়ে চলে গেল চিরকালের মত।

ওদিকে হল কি, দমনক চলে যাবার পর সঞ্জীবক ভাবতে লাগল, কি করা উচিত। দমনকের কথায় কাপুরুষের মত পলায়ন করার চেয়ে বীরের মত যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করাও ভাল। এই স্থির করে সে সিংহের হাবভাব লক্ষ্য করবার জন্য তার গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাথা উঁচু করে। সঞ্জীবকের ভাব দেখে পিঙ্গলকের সন্দেহ আরো দৃঢ় হল। তবে তো দমনক সত্যিই বলেছে। আর দেরি করলে বাঁচবার উপায় থাকবে না মোটেই। ভেবেই সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল সঞ্জীবকের উপর। সঞ্জীবকও ছাড়বার পাত্র নয়। শিং বাগিয়ে সেও সিংহকে আক্রমণ করল বীর-বিক্রমে। লেগে গেল দুজনে দারুণ যুদ্ধ। রক্তের বান ছুটল দুজনের গা বয়ে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর সঞ্জীবক কাবু হয়ে লুটিয়ে পড়ল সেখানে। আর উঠল না। সিংহ বেঁচে রইল বটে কিন্তু

শিংয়ের আঘাতে তার একটা চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল চিরকালের মত। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অতি কষ্টে সে গুহার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল।



দমনক আড়াল থেকে দেখছিল সমস্ত ঘটনা। পিঙ্গলক গুহার মধ্যে যেতেই সে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, তারপর সিংহের সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল।

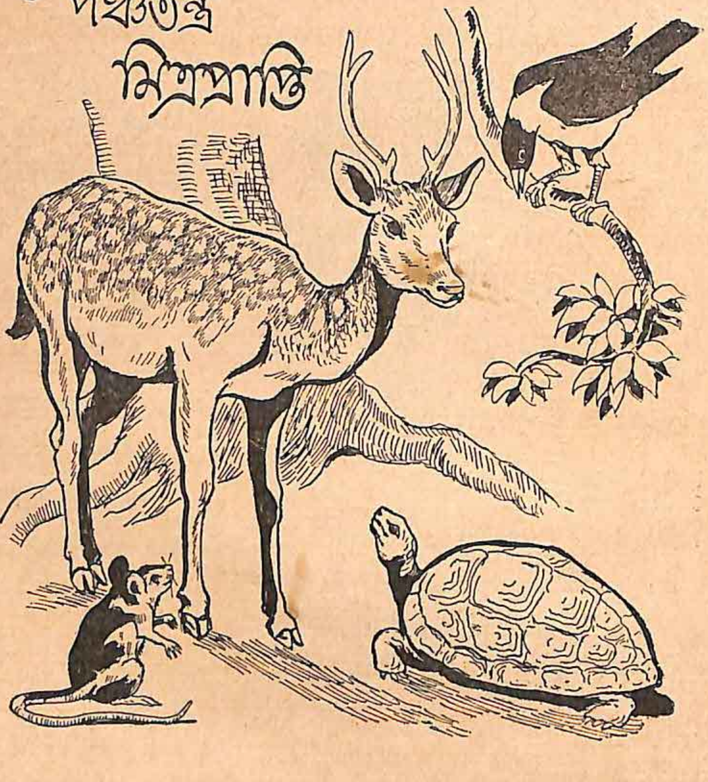
মন্ত্রীকে দেখে সিংহ ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, 'দমনক, মনে হচ্ছে কাজটা মোটেই ভাল হল না। শাস্ত্রে আছে যারা বন্ধুদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক তাদের নরকবাস হয়।'

সিংহকে সান্ত্বনা দিয়ে দমনক বলল, 'সামান্য একটা তৃণভোজী জন্তুর জন্য আপনার এরকম মন খারাপ করা উচিত হয় না, মহারাজ। শাস্ত্রে আছে দয়ালু রাজা, সর্বভোজী ব্রাহ্মণ, নির্লজ্জা স্ত্রীলোক, দুষ্টবুদ্ধি বন্ধু, প্রতিকূলাচারী ভৃত্য আর অসতর্ক কর্মচারীকে কখনো বিশ্বাস করবে না। কাজেই আপনার এজন্য উতলা হওয়া মোটেই শোভা পায় না।'

এই ভাবে মিত্রভেদ ঘটিয়ে দমনক তার মন্ত্রীত্ব পাকা করে নিল।

• পঞ্চতন্ত্র

মিত্রপ্রাপ্তি



বিষ্ণুশর্মার গল্প শুনে রাজকুমারেরা বলল, 'গুরুদেব, আপনার গল্প শুনে আমাদের যেমন আনন্দ হয়েছে তেমনি শিক্ষাও পেয়েছি প্রচুর। এমনটি আর আমরা জীবনে কখনো শুনিনি।'

মৃদু হেসে পণ্ডিত বললেন, 'শোননি ত? তবে কাল সকালে আবার এসো। এবার তোমাদের মিত্র লাভের কয়েকটি গল্প বলব। এতে তোমরা আরো নূতন রকমের শিক্ষা লাভ করবে।' তারপর পরদিন রাজকুমারেরা আসতেই তিনি গল্প আরম্ভ করলেন—

পায়রা, ইঁদুর ও কাকের কাহিনী

অবন্তীরাজ্যের রাজধানী অবন্তীপুরের পরেই প্রকাণ্ড ত্রিপর্ণীর মাঠ গিয়ে মিশেছে দূর বিন্ধ্য পর্বতের নিচে। সেই মাঠের মাঝখানে আছে এক আদ্যিকালের বুড়ো বটগাছ। যতরাজ্যের কাক এসে বাসা বেঁধেছে সেই গাছে। বহুকাল ধরে তারা সেখানে বেশ আরামে আছে। রোজ ভোর হতেই সব্বাই বেরিয়ে যায় খাবারের সন্ধানে, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে। এইভাবে দিন যায়।

একদিন হল কি, কোথা থেকে একটা লোক এসে উপস্থিত হল সেই মাঠের মধ্যে, বটগাছের কিছুদূরে। লোকটার কাঁধে একখানা পাখি ধরা জাল আর হাতে ছোট থলেয় এক থলে চাল। লোকটা এসেই একবার এদিক ওদিক দেখল ভাল করে। তারপর মাটিতে সেই চালগুলো ছড়িয়ে দিয়ে, তার উপর সেই জালখানা পেতে রাখল ভাল করে; পেতে রেখেই সে করল কি, গুটি গুটি গিয়ে লুকিয়ে রইল সেই বটগাছের আড়ালে।

কাকদের দলপতি লঘুপতন বসে ছিল গাছের মগডালে। সে বুঝতে পারল এই লোকটা হচ্ছে একটি পাখি শিকারী। পাখি ধরবার জন্যই সে ফাঁদ পেতেছে। লঘুপতন তখনি দলের সব্বাইকে সাবধান করে দিয়ে বলল, "ভাইসব, হুঁশিয়ার—ভুলেও যেন কেউ ওদিক মাড়িও না। মাড়ালে কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু।"

দলপতির কথায় সকলেই সাবধান হল এবং দূর গাঁয়ের দিকে চলে গেল খাবারের খোঁজে। লঘুপতন কিন্তু গেল না সেখান থেকে। ঠায় বসে রইল গাছের ডালে সেই জালখানার উপর লক্ষ্য রেখে।

খানিকক্ষণ পর দেখা গেল এক ঝাঁক পায়রা উড়ে আসছে আকাশের উপর দিয়ে। পায়রাগুলো উড়ে এসে ঘুরতে লাগল সেই জালখানার উপর, তারপর 'হু-স্' করে নেমে পড়ল সেখানে। যেই নামা অমনি আটকা পড়ল জালের মধ্যে।

আটকা পড়তেই পায়রাগুলো ঝাপটা-ঝাপটি লাগিয়ে দিল প্রাণ ভয়ে। ফাঁদে পাখি পড়েছে দেখে শিকারী ত খুব খুশি। তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এল বনের আড়াল থেকে। তাকে দেখে সর্দার পায়রা চেঁচিয়ে উঠল, "চুপ করে দাঁড়াও সব যদি বাঁচতে চাও। ঐ দেখ শিকারী আসছে।"

সর্দারের কথায় সবাই চুপ করে গেল। তখন সর্দার বলল, "ভাই সব, আর সময় নেই। এসো, আমরা সব্বাই একসঙ্গে জালসুদ্ধ উঠে পড়ি দূর আকাশে। আগে ত' এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাক, তারপর যা হয় করা যাবে।"

সর্দার পায়রার কথায় পায়রাগুলো সব এক সঙ্গে উঠে পড়ল আকাশের উপর, জালসুদ্ধ। শিকার ত' হতভম্ব—পাখিগুলো ত' গেলই, সঙ্গে সঙ্গে তার জালখানাও খোয়াতে হল।

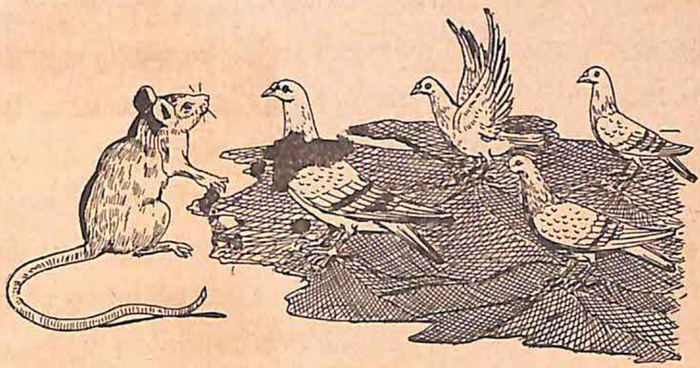
গাছের ডালে বসে লঘুপতন দেখছিল সমস্ত। পায়রাগুলো জাল নিয়ে উড়তেই সেও চলল তাদের পেছনে। দেখতে হবে ওরা কি করে মুক্তি পায়। উড়তে উড়তে পায়রাগুলো গিয়ে থামল এক উপত্যকার উপর। তারপর ধীরে ধীরে নেমে পড়ল এক গাছের নিচে। নেমেই ডাক দিল, "বন্ধু হিরণ্যক, বাড়ি আছ না কি? বেরিয়ে এসে আমাদের প্রাণ বাঁচাও।"

গাছের নিচে ছিল একটা ছোট্ট গর্ত। পায়রার ডাক শুনে সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে এল এক মেঠো ইঁদুর। এসেই সে একেবারে চমকে উঠল, "কি সর্বনাশ—এ কি করে হল, ভায়া?" বলেই হিরণ্যক ছুটে এল সর্দার পায়রার কাছে।

সর্দার বলল, "আর কি করে হল! সেই যে কথা আছে না, 'লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু।' আমাদেরও হয়েছে সেই দশা। চাল খেতে গিয়ে এখন প্রাণ যায় আর কি!"

পায়রার কথা শুনেই হিরণ্যক বলল, "যা বললে বন্ধু তা অবশ্য

সত্যি, কিন্তু এছাড়া আরও একটা কথা আছে, সে হচ্ছে নিয়তি! নিয়তির খেলাতেই ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ এই সব হচ্ছে। নিয়তিকে বাধা দেবার সাধ্য কারু নেই।”



সর্দার বলল, “তা বটে, কিন্তু তবুও আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে মাঠের মাঝখানে অমনি অমনি কেউ চাল ছড়িয়ে রাখে না। নিশ্চয়ই ওখানে কিছু গোলমাল আছে।”

মাথা দুলিয়ে হিরণ্যক বলল, “বুঝতে দিলে তো বুঝবে। নিয়তি যে বুদ্ধি নাশ করে দেয়। এই দেখ না স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্র কি জানতেন না যে হরিণ কখনো সোনার হয় না! তারপর দেখ রাবণ আর যুধিষ্ঠিরের অবস্থা। ঐ নিয়তিই বুদ্ধি নাশ করে দিয়েছিল বলে রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে সবংশে ধ্বংস হল আর যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সর্বস্ব খুইয়ে কি কষ্টই না পেলেন। যাক যা হয়েছে তা নিয়ে আর বাদ-বিতণ্ডা করে লাভ নেই। এসো, জাল কেটে একে একে সবাইকে মুক্ত করে দিই।” বলেই হিরণ্যক আগে সর্দারের বাঁধন কাটতে গেল। কিন্তু সর্দার বাধা দিয়ে বলল, “তা হয় না বন্ধু,

আমি হচ্ছি এদের পরিচালক, পরিচালকের উচিত আগে তার দলের সকলের মুক্তি সাধন করা। কাজেই আগে আমার দলের সব্বাইকে মুক্ত করে দাও, তারপর আসবে আমার পালা।"

মৃদু হেসে হিরণ্যক বলল, "এ জ্ঞান আমারও আছে, বন্ধু। আমি শুধু তোমাকে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম মাত্র। কিছু মনে করো না।"

এই বলে হিরণ্যক একে একে সব পায়রাকে মুক্ত করে দিল। পায়রারাও তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল আকাশপথে।

গাছের ডাল থেকে লঘুপতন সবই লক্ষ্য করছিল। হিরণ্যকের ব্যবহার আর কথাবার্তায় সে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং মনে মনে স্থির করল যে সে-ও হিরণ্যকের সঙ্গে মিত্রতা করবে। এই স্থির করে লঘুপতন গিয়ে দাঁড়াল হিরণ্যকের গর্তের কাছে। পায়রাগুলো চলে যেতে হিরণ্যকও ঢুকে পড়েছিল তার গর্তের মধ্যে। লঘুপতন গর্তের কাছে গিয়েই ডাকল, "বন্ধু হিরণ্যক, একবার বেরিয়ে আসবে ভাই ?" হিরণ্যক ভাবল বোধ হয় পায়রাগুলো আবার ফিরে এসেছে, তাই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। এসে দেখে, ওরে বাবা এ যে সাক্ষাৎ যম এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে! ভয়ে সে তখনি আবার ঢুকে পড়ল গর্তের ভেতর। দেখে লঘুপতন বলল, "পালিয়ে গেলে কেন ভাই ? তোমার ব্যবহার আর কথাবার্তা আমার বড়ই ভাল লেগেছে, তাই তোমার সঙ্গে আমি মিত্রতা করতে এসেছি। বেরিয়ে এস, কোন ভয় নেই।"

গর্তের ভেতর থেকে হিরণ্যক বলল, "এখান থেকেই তোমাকে নমস্কার জানাচ্ছি, ভায়া। খাদ্য-খাদকের মধ্যে মিত্রতা হতে পারে—এ আমি কোথাও শুনিনি। কাজেই তুমি তোমার পথ দেখতে পার, আমি বেরোচ্ছি না কিছুতেই।"

দুঃখিত হয়ে লঘুপতন বলল, "তোমার কথায় মনে বড়ই ব্যথা

পেলাম, বন্ধু। কাক ইঁদুরের শত্রু বটে, তা বলে কি কোনো কালেও মিত্র হতে পারে না ?"

হিরণ্যক বলল, "কিছুতেই না, শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করলে তার ফল কোন কালেই ভাল হয় না। এ ছাড়া যারা কপট তারা বন্ধুত্বের ছল করেই লোকের সর্বনাশ করে। পুরাণে আছে, দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়েও বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন।" লঘুপতন বলল, "সবাই তো ইন্দ্রের মত না-ও হতে পারে।" হিরণ্যক বলল, "তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, সাপ আর বেজী, জল ও আগুন, কুকুর এবং বিড়াল, ধনী আর দরিদ্র, মূর্খ ও পণ্ডিত, সুজন এবং দুর্জন পরস্পর একেবারে জাতশত্রু।"

হাল ছাড়ল না লঘুপতন। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "তা বটে, কিন্তু মূর্খেরাই পরস্পর শত্রুতা করে মরে, পণ্ডিতেরা নয়। তোমার মত জ্ঞানবান ও সহৃদয় লোকের সঙ্গে কি কেউ শত্রুতা করতে পারে ?"

হিরণ্যক ভাবল কাকটার কথা মিষ্টি বটে, তবুও একবার ভাল করে বুঝে নিতে হবে ওর আসল উদ্দেশ্যটা কি। এই ভেবে সে বলল, "দেখ ভাই লঘুপতন, তোমার কথা সত্য বটে; কিন্তু একটি কথা আছে। জন্ম-শত্রুর সঙ্গে যদি কোন কারণে বন্ধুত্ব হয়ও তাতে তার ভবিষ্যৎ খুব সুখকর হয় না। আবার কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি মনে করেন যে তিনি পণ্ডিত বলে কেউ তাঁর অনিষ্ট করবে না, তা হলে তার মস্ত বড় ভুল করা হবে। কারণ, কথিত আছে যে বিখ্যাত ব্যাকরণকার পাণিণিকে সিংহের থাবায় প্রাণ দিতে হয়েছিল। মীমাংসা দর্শন রচয়িতা জৈমিনির প্রাণ গিয়েছিল হাতির পায়ের তলায় পড়ে। আর ছন্দোশাস্ত্রকার পিঙ্গলকে কুমীরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

কাতর কণ্ঠে লঘুপতন বলল, "ভাই, তুমি হলে পণ্ডিত ব্যক্তি, যুক্তি তর্কে আমি তোমার সঙ্গে পারব না। তবে আমার সোজা কথা এই, তুমি যদি আমাকে মিত্র বলে গ্রহণ না কর, তবে আমি

এখান থেকে কিছুতেই উঠব না। না খেয়ে দেয়ে ঠায় বসে প্রাণ ত্যাগ করব।"

এবার হিরণ্যকের মন গলে গেল। গর্তের ভেতর থেকে একটু মুখ বাড়িয়ে বলল, "না ভাই লঘুপতন, ওসব করো না। আমি তোমার কথায় রাজী হলাম। কিন্তু একটি সর্তে। তুমি রোজ একবার করে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে আর আমি এইভাবেই একটু দূর থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব। কেমন, এতে রাজী ?"

খুশি হয়ে লঘুপতন বলল, "তাই হোক বন্ধু, আমি তাতে সম্পূর্ণ রাজী আছি।"

সেই থেকে লঘুপতন আর হিরণ্যকের মধ্যে মিত্রতা হয়ে গেল। রোজ লঘুপতন আসে আর গর্ত থেকে গলা বের করে একটু দূর থেকেই কথাবার্তা বলে। এইভাবে চলল কিছুকাল। ক্রমে হিরণ্যকের ভয় ভেঙে গেল। সে বুঝল যে, লঘুপতন সত্যিই খুব ভাল। ওকে দিয়ে তার কোন ক্ষতি হবে না। এখন দুই বন্ধুতে আর দূর থেকে কথাবার্তা হয় না। পরস্পর গা ঘেঁষে বসে গল্প-গুজব করে। দেখতে দেখতে বছর কেটে গেল। বছর শেষে লঘুপতন বলল, "বন্ধু, আমাদের মিত্রতার এক বছর কেটে গেল।"

খুশি মনে হিরণ্যক বলল, "আমাদের বন্ধুত্ব চিরকাল ধরে বেঁচে থাকুক বন্ধু, এই আমার অন্তরের কামনা।"

বছর দুই চলল এইভাবে। তারপর হঠাৎ সেই দেশে দেখা দিল বিষম দুর্ভিক্ষ। খাবারের অভাবে সব্বাই পালিয়ে যেতে লাগল দেশ ছেড়ে।

দেখে শুনে একদিন লঘুপতন হিরণ্যককে বলল, "বন্ধু, দেশের যা অবস্থা হয়েছে, এতে আর এদেশে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। তাই স্থির করেছি এ জায়গা ছেড়ে বিদেশে চলে যাব। তোমাকেও কিন্তু

আমার সঙ্গে যেতে হবে।”

আপত্তির স্বরে হিরণ্যক বলল, “তা করো না বন্ধু, দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে বটে, তা’ বলে এতকালের বাস, হুট্‌ করে ছেড়ে যাওয়া ভাল নয়। শাস্ত্রে আছে—এ সংসারে দানের তুল্য পুণ্য নেই, লোভের চেয়ে শত্রু নেই, চরিত্রের সমান ভূষণ নেই, আর সন্তোষের সমান ধন নেই।”

লঘুপতন বলল, “ভাগ্য-অন্বেষণে বিদেশ যেতে দোষ নেই। আমাদের যেতেই হবে এদেশ ছেড়ে। আর আপত্তি করো না।”

হিরণ্যক বলল, “কোথায় যাবে স্থির করেছ? অজানা জায়গায় গিয়ে শেষে বিপদে পড়ব না ত’?”

মৃদু হেসে লঘুপতন বলল, “তা কেন, জানাশোনা লোকের কাছেই যাব। হেরম্ব রাজ্যের এক হ্রদে থাকে আমার বন্ধু, কচ্ছপ মন্থরক। বহুকালের পুরোনো বন্ধু সে। সেখানে আমরা বেশ আরামেই থাকতে পারব।”

হিরণ্যক বলল, “বেশ, তাহলে ত আর কোন কথা নেই। কিন্তু আমি এতদূর যাব কি করে? বেশি জোরে ত’ হাঁটতে পারি না। এ ছাড়া পথে বিপদাপদের আশঙ্কাও কম নয়।”

উৎসাহে ডানা দুখানা ঝেড়ে নিয়ে লঘুপতন বলল, “সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার পিঠে বসিয়ে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।”

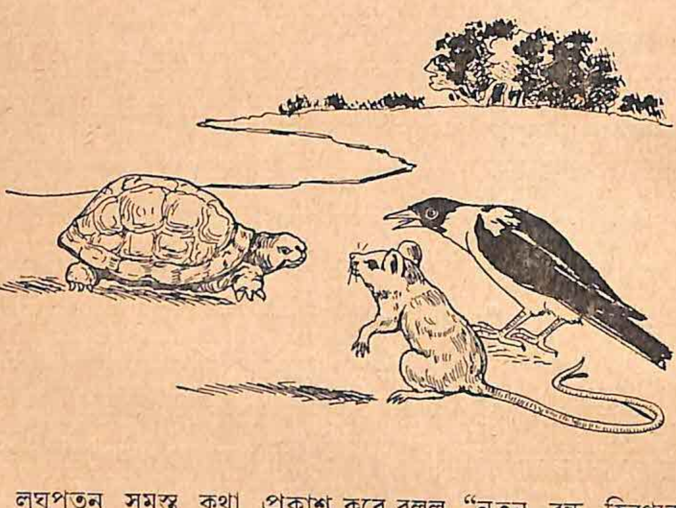
পরদিন ভোরে লঘুপতন চলল মন্থরকের কাছে হিরণ্যককে পিঠে নিয়ে। দূর আকাশের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে সে যখন গিয়ে নামল সেই হ্রদের পাড়ে, তখন পূর্বের সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে।

মন্থরক তখন পড়ন্ত রোদে বসে দেহটা একটু গরম করে নিচ্ছিল। এমন সময় পেছনে শব্দ হল ‘ঝুপ্‌’। শব্দ শুনেই মন্থরক গিয়ে লাফিয়ে

পড়ল গভীর জলে।

"আরে ডুব দিও না—ডুব দিও না—আমি লঘুপতন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" বলেই লঘুপতন হিরণ্যককে নামিয়ে দু-তিনবার পাখা ঝেড়ে নিলে।

মাথা তুলে মন্থরক দেখল, বন্ধু লঘুপতন পাড়ে বসে পাখা ঝাড়ছে। হাসতে হাসতে সে উপরে উঠে এল, "বাঃ—বাঃ—ভায়া যে, কতকাল পরে এলে বল দেখি, কেমন আছ ?"



লঘুপতন সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলল, "নূতন বন্ধু হিরণ্যককে নিয়ে তোমার এখানে চলে এলাম, ভায়া। আশা করি এখানে আমরা ভালই থাকব।"

"নিশ্চয়ই থাকবে। এদেশে ওসব দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কোন বালাই নেই, ভাই। পাহাড় আর সমতল মিলিয়ে আমাদের এই রাজ্য। বৃষ্টি হয় প্রচুর। তাই কারো কখনো খাবার অভাব হয় না। ওদেশ ছেড়ে এসেছ ভালই হয়েছে। তিন বন্ধুতে মিলে বেশ আরামেই থাকা যাবে।"

হিরণ্যক এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। কি জানি মন্থরক তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে। এখন মন্থরকের কথায় খুশি হয়ে বলল, "মনের ভাব না হলে মিত্রতা স্থায়ী হতে পারে না। দেখছি আমাদের তিনজনের মধ্যেই মনের মিল আছে। কাজেই তিনজনেই আমরা মনের সুখেই থাকতে পারব একই জায়গায়।"

মন্থরক বলল, "থাকবেই তো। আমি থাকব ঐ হ্রদের জলে, বন্ধু লঘুপতন থাকবে পাড়ের কিনারে ঐ বটগাছটার উপর, আর তুমি থাকবে ওর নিচে মাটিতে গর্ত করে। বেশ সুখেই থাকব সব্বাই।"

মন্থরকের কথায় লঘুপতন বলল, "জান বন্ধু? আমাদের এই হিরণ্যক ভায়া বড় যে সে লোক নয়। শাস্ত্র, পুরাণ সব মুখস্থ। কিছু কাল হল ইনি সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য নিয়েছেন।"

"বটে, বটে, বৈরাগ্য নিয়েছেন? তা এ বয়সে হঠাৎ বৈরাগ্য নেবার কারণ?" গলা বের করে মন্থরক নড়ে চড়ে বসল।

মৃদু হেসে হিরণ্যক বলল, "সে অনেক কথা। যদি শুনতেই চাও তোমরা, তা হলে বলছি।" বলেই সে আরম্ভ করল—

হিরণ্যকের আত্মকথা

বেশ কিছুকাল আগের কথা। মহিলারোপ্য নগরের শেষ প্রান্তে ছিল এক বিশাল শিব মন্দির। সেই মন্দিরের পূজারী ছিলেন সাধু তাম্রচূড়। তাম্রচূড় থাকেন সেখানে আর নিয়মিত ভাবে বিগ্রহের সেবা পূজা করেন। এছাড়াও তাঁর একটি কাজ ছিল। তিনি রোজ ভিক্ষা করে যা চাল নিয়ে আসতেন তা পরদিন বিলিয়ে দিতেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে।

আমি থাকতাম সেই মন্দিরের ভিটার নিচে দলবল নিয়ে। একদিন হল কি, দলেই সব্বাই এসে আমাকে বলল, 'প্রভু, এই সাধু রোজ প্রচুর চাল নিয়ে এসে তুলে রাখেন উঁচু তাকের উপর।' আমরা অতদূর উঠতে

পারি না। কাজেই এমন ভাল খাবার কাছে পেয়েও খাওয়া হয় না। আপনি আমাদের নায়ক, ইচ্ছা করলে আপনার দ্বারা এর একটা উপায় হতে পারে।

সেইদিন রাতে আমি দলবল সহ গেলাম সেখানে। দেখি উঁচু তাকের উপর একটা ঝুড়ি রয়েছে। ঐ ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে সেই ভিক্ষা করা চাল। তিন লাফে আমি উঠে পড়লাম সেই তাকের উপর। আর চাল খেতে খেতে তার কতক ছড়িয়ে দিতে লাগলাম দলবলের মধ্যে। তারাও আনন্দ করে সেই সব চাল খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল। তারপর ভোর হবার আগেই সবাই দে পিটটান যে যার গর্তে।

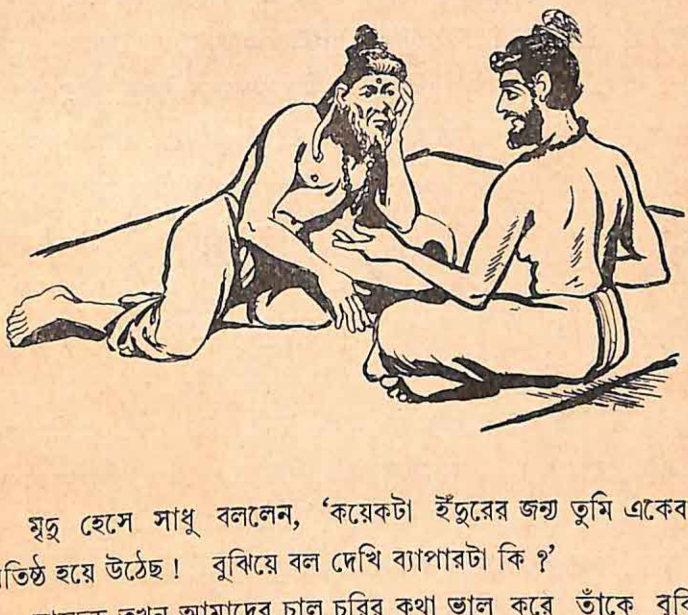
পরদিন ভোরে চাল আনতে গিয়ে সাধুর চক্ষুস্থির। অর্ধেক চালই উধাও হয়ে গেছে। সেই থেকে তাম্রচূড় শুয়ে থাকেন এই কামরায় একটা লাঠি পাশে নিয়ে। আর আমাদের সাড়া পেলেই মেঝের উপর জোরে লাঠি পেটা করেন।

এইভাবে দিন যায়। একদিন এক তীর্থযাত্রী সাধু পুরী যাত্রার পথে এসে আশ্রয় নিলেন এই মন্দিরে। পূজারী তাম্রচূড় তাঁকে দেখে ভারি খুশি হলেন এবং কয়েক দিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। সাধুও তাঁর কথা রক্ষা করে রইলেন সেখানে কয়েকদিনের জন্য।

রাত্রে প্রসাদাদি পাওয়ার পর সাধু মেজের উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। দুজনের মধ্যে নানারকম ধর্ম আলোচনা হতে লাগল। আগন্তুক সাধু অনবরত বলেই যাচ্ছেন শাস্ত্রের কথা, কিন্তু তাম্রচূড় সে সব মন দিয়ে শুনতে পারছেন না। তাঁর মন ত' পড়ে আছে আমাদের দিকে। কাজেই সাধুর কথায় ঠিক ঠিক উত্তর দিচ্ছেন না। মাঝে মাঝে শুধু একটু হুঁ, হাঁ করে নিয়ম রক্ষা করছেন মাত্র।

দেখে সাধু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি কেবল হুঁ, হাঁ, বলে দায়সারা কাজ করছ, আমার কথা কি তুমি মন দিয়ে শুনছ না ?'

অপ্রতিভ হয়ে তাম্রচূড় বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, প্রভু। একটা দুষ্ট ইঁদুর আর তার দলবলের জ্বালায় আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তাই আপনার কথায় মন দিতে পারছি না।'



মৃদু হেসে সাধু বললেন, 'কয়েকটা ইঁদুরের জন্য তুমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ! বুঝিয়ে বল দেখি ব্যাপারটা কি ?'

তাম্রচূড় তখন আমাদের চাল চুরির কথা ভাল করে তাঁকে বুঝিয়ে বলল।

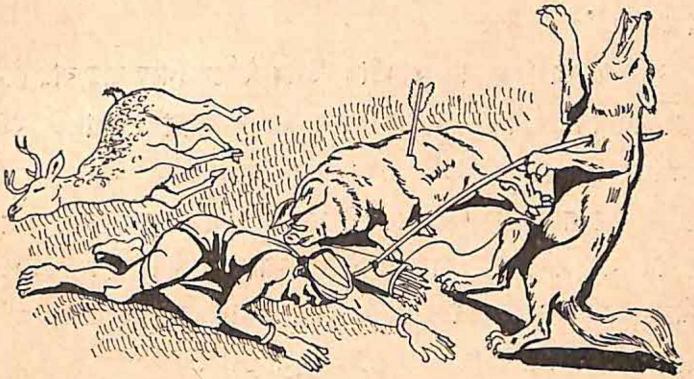
সব শুনে সাধু বললেন, 'ঐ ধেড়ে ইঁদুর যে এতদূর লাফাতে পারে তার বিশেষ কারণ আছে। কথায় বলে ধন থাকলেই আসে অহঙ্কার। আর অহঙ্কার তেজ বৃদ্ধি করে। খুঁজে দেখ ঐ ইঁদুরটার গর্তের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রকম রত্ন আছে। তাই ওর এত তেজ। আরও শোন "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"। এ বিষয়ে তোমাকে এক গল্প বলছি।' বলেই সাধু আরম্ভ করলেন—

কৃপণ শেয়ালের গল্প

বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যে এক বিশাল উপত্যকা, ঘন বন-জঙ্গলে ভরা। সেই বনের ভেতর দিয়ে চলেছে এক শিকারী। শিকারীর হাতে তীর ধনুক আর পিঠে একটা মরা হরিণের বাচ্চা। ঝর্নার ধারে ওটাকে সে শিকার করেছে। চলেছে শিকারী আপন মনে! হঠাৎ পিছনে শব্দ হল 'ঘোঁৎ, ঘোঁৎ, ঘোঁৎ'। ফিরে দাঁড়াল শিকারী। সঙ্গে সঙ্গে এক মস্ত বড় দাঁতাল শূকর বেরিয়ে এল বনের ভেতর থেকে। আর যায় কোথায়, হরিণটাকে নামিয়ে রেখে শিকারী মারল এক তীর শূকরের উপর। অব্যর্থ লক্ষ্য। তীরটা গিয়ে লাগল শূকরটার পেটে, একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে। শূকরটাও ছাড়বার পাত্র নয়। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে বন কাঁপিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারীর উপর। তার আক্রমণে শিকারীর দফা শেষ হয়ে গেল। শূকরটাও কিন্তু আর চলতে পারল না। শিকারীর কাছেই সেও ঢলে পড়ল মরণের কোলে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। এমন সময় এক খেঁকশিয়ালী এসে দাঁড়াল সেখানে। এক সঙ্গে এত খাবার দেখে শেয়ালের আনন্দ আর ধরে না। ঘুরে ঘুরে সে শুঁকতে লাগল সেই মৃতদেহগুলো। শুঁকছে আর ভাবছে, "তাইত, এতগুলো চমৎকার খাবার, কোন্‌টা আগে খাই! হরিণটায় সাতদিন, শূকরটায় দশদিন, আর মানুষটায় অন্ততঃ পনর কুড়ি দিন ত চলবেই। বিজ্ঞ ব্যক্তি এক সঙ্গে সমস্ত খরচ করে না। কাজেই আমাকেও বুঝে-সুঝে চলতে হবে।" ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার নজর পড়ল ধনুকখানার উপর। ধনুকের ছিলা-গাছটি পশুর নাড়ী নিয়ে তৈরি। মুহূর্তে শেয়ালের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। "আজ রাতটা ঐ ছিলাগাছটি দিয়েই চালিয়ে দি। বাকি সবের সদ্ব্যবহার কাল থেকে আরম্ভ করলেই চলবে।" ভেবেই শিয়ালটা করল কি—সেই ছিলাগাছটি ধরে চিবোতে লাগল।

"কচ্, মচ্, কচ্, মচ্—ছ্যাটাং"—ছিলাগাছটা গেল ছিঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের বাঁটখানা ছিট্‌কে গিয়ে বিঁধল শেয়ালটার বুকে, একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ছট্‌ফট্ করে সেও লুটিয়ে পড়ল সেখানে।



গল্প শেষ করে সাধু বললেন, 'তাম্রচূড়, প্রদীপটা একবার ধরাও তো, দেখতে হবে ওর গর্তটা খুঁড়ে ওখানে কি আছে।'

প্রদীপ জ্বালিয়ে দুই সাধু লেগে গেলেন মাটি খুঁড়তে। বেগতিক দেখে আমি পালালাম দলবল সহ অন্য পথে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে গর্ত ছেড়ে বেরোতেই দেখি সামনে এক মস্ত বড় হুলো বেড়াল। দেখেই যে যেদিকে পারলাম দে ছুট। তাতে আমরা অনেকে বেঁচে গেলাম বটে কিন্তু কয়েকটিকে প্রাণ দিতে হল সেই বেড়ালের থাবায়।

এদিকে হল কি, সাধুরা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এসে হাজির আমার বাসায়। গর্তের মধ্যেই ছিল একটি সূর্যকান্ত মণি, কতকাল সেটা পড়ে আছে সেখানে কেউ জানে না। সাধুরা সেই মণিটি নিয়ে রেখে দিলেন বিছানার মধ্যে।

সারাদিন তো কোনরকম কাটল ভয়ে ভয়ে। তারপর রাত হতেই সব্বাইকে নিয়ে চললাম খাবারের সন্ধানে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন সাধু দুজন। আমাদের সাড়া পেয়েই তাম্রচূড় মাটিতে লাঠি ঠুকতে লাগলেন। দেখে সাধু বললেন, 'ও আর তোমায় করতে হবে না। ওর শক্তি তো আমরা হরণ করে নিয়ে এসেছি, আর ও অতদূর লাফাতে পারবে না।'

সত্যিই তাই হল। তাকটার উপর উঠতে গিয়ে বার বার বিফল হয়ে এলাম। আমার অবস্থা দেখে দলের সব্বাই বলাবলি করল, 'দলপতি হিরণ্যকের আর আমাদের ভরণপোষণের ক্ষমতা নেই। কাজেই এখন যে যার পথ দেখাই ভাল।' বলেই তারা চলে গেল—আমার সঙ্গ ছেড়ে। ভারি দুঃখ হল আমার মনে। ভেবে দেখলাম দরিদ্রের মত দুঃখী আর কেউ নেই। ধনহীন পুরুষ, ব্রাহ্মণ বর্জিত শ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞের কোন মূল্য নেই।

পরদিন রাত্রে চুপি চুপি আবার গিয়ে ঢুকলাম সাধুদের ঘরে। দেখি যদি সেই মণিটি আবার নিয়ে আসা যায়। কিন্তু দৈব বিমুখ। আমার সাড়া পেয়েই তাম্রচূড় লাঠি ছুঁড়ে মারলেন শব্দ লক্ষ্য করে। ভাগ্যিস অন্ধকার ছিল, তাই কোনমতে পালিয়ে বাঁচলাম। নইলে মাথাটা চুরমার হয়ে যেত। তবেই দেখ, ধন পেলেও জ্বালা, আর না পেলেও যন্ত্রণার একশেষ। অগত্যা বিরক্ত হয়ে বৈরাগ্য নিয়েছি; আর সংসারে ফিরব না।'

গল্পটি শুনে মন্থরক বলল, 'এজন্য আর দুঃখ করে লাভ নেই বন্ধু। যে ধন তুমি ভোগ করতে না, তা রেখেই বা লাভ কি! আরও কথা আছে, ভাগ্যে না থাকলে ধন পেলেও তা ভোগে আসে না। সোমিলক তো ধন পেয়েও তা ধরে রাখতে পারেনি।'

হিরণ্যক বলল, 'রাখতে পারেনি কেন, কি হয়েছিল তার ?'

মন্থরক বলল, 'সে ভারি মজার গল্প, বলছি শোন—

সোমিলকের কথা

অবন্তী রাজ্যের এক গাঁয়ে বাস করত তাঁতী সোমিলক ও তার বউ। ভারি চমৎকার ছিল সোমিলকের হাত। অমন মিহি কাপড় সে অঞ্চলে আর কেউ তৈরি করতে পারত না সে ছাড়া। কিন্তু মিহি কাপড়ের চাহিদা ছিল কম, তাই যা উপায় হত তাতে তাদের সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

বিরক্ত হয়ে একদিন সোমিলক তার বউকে বলল, "গিন্নি, এ ভাবে তো আর চলে না। আমি স্থির করেছি একবার বিদেশে গিয়ে চেষ্টা করে দেখব—ভাগ্য ফেরে কি না।"

বাধা দিয়ে বউ বলল, "কেন বাজে বকছ বল ত'? বিদেশে গেলেই কি তুমি কাড়ি কাড়ি টাকা পাবে মনে করেছ? ভাগ্যে যদি না থাকে তবে টাকা পেয়েও তা তুমি রাখতে পারবে না। কাজেই ওসব বাজে খেয়াল ছেড়ে ঘরে বসেই কাজ কর, অনর্থক ছুটোছুটি করো না।"



ভারি বিরক্ত হল সোমিলক বউয়ের কথায়। চড়া গলায়

বলল, "সাধে কি শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন যে স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! ঘরে বসে থাকলেই কি তোমার সব হয়ে যাবে? উদ্যোগী পুরুষ ছাড়া কে কবে লক্ষী লাভ করেছে শুনি? আমি যাবই, কারো কথা শুনব না।"

ক্ষুণ্ণ মনে বউ বলল, "বেশ, দেখ না ঘুরে ফিরে; কিছু করতে পার কি না।"

বিদেশে গিয়ে সোমিলকের বেশ ভালই হল। সেখানে তার কাপড়ের চাহিদা হল খুব। এক বছরে তার তিনশ' মোহর লাভ হল।

বছর শেষে সোমিলক তার মোহর সব নিয়ে চলল দেশে। বউকে গিয়ে দেখাবে, কার কথা সত্যি। তারপর মোহরগুলো বাড়িতে রেখে আবার যাবে কর্মস্থলে, আর প্রচুর অর্থ নিয়ে এসে দেবে বউয়ের হাতে। এইভাবে টাকা জমিয়ে তারা হয়ে উঠবে মস্ত বড়লোক। টাকার সুদ থেকেই তাদের সব কাজ চলবে—আসলে হাত দিতে হবে না মোটেই। দান-ধ্যানের নামও সে মুখে আনবে না। জমা টাকা নষ্ট করে বোকা বনবার কি অর্থ?

এই রকম ভাবতে ভাবতে চলেছে সোমিলক। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন তার খেয়াল হল, 'তাইত, এতগুলো মোহর নিয়ে এখন থাকি কোথায়? সামনেই মস্ত বড় বন। এর ভেতর দিয়েই ত' যেতে হবে। এই অন্ধকারে বনের মধ্যে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে বেরোতে হবে না।' ভেবেচিন্তে সোমিলক একটা বড় গাছের উপর উঠে বসে রইল। রাত ভোর হলে তার পর যা হয় করা যাবে। একটা বেশ বড় কোটরের মধ্যেই বসে ছিল সোমিলক, ডালে হেলান দিয়ে। দেখতে দেখতে চোখ দুটো তার বুঁজে এল। ভোর হলে সোমিলকের ঘুম ভেঙে গেল। এবার নামতে হবে গাছ থেকে। ভেবেই সে কোমরে হাত দিয়ে দেখে

মোহরের থলেটা তো নেই, কোটরের ভেতরটা ভাল করে খুঁজে দেখল। নাঃ, কোথাও কিছু নেই। সোমিলকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। অস্থির হয়ে সে নেমে পড়ল গাছ থেকে। তারপর নিচেটা ভাল করে খুঁজে দেখল কিন্তু থলের সন্ধান মিলল না।

গাছটার নিচে এসে সোমিলক কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর ফিরে চলল আবার কর্মস্থলে। খালি হাতে সে কি করে গিয়ে দাঁড়াবে বউয়ের সামনে ?

আবার এক বছর ধরে সোমিলক কঠোর পরিশ্রম করল। তার ফলে এবার পেল পাঁচশ' মোহর। মোহরগুলো খুব ভাল করে কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে সে দেশে রওয়ানা হল। চলেছে সোমিলক মেঠো রাস্তা ধরে। এমন সময় খানিক দূরে তার সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল তুজন লোক। এসেই তারা তার আগে আগে চলতে লাগল।

নির্জন মাঠে হঠাৎ এল কোথা থেকে ? আবার তারই আগে আগে চলেছে। ভয়ে সোমিলকের বুক কেঁপে উঠল। শক্ত হাতে মোহরের থলেটা চেপে ধরে সে চলতে লাগল ওদের পেছনে।

লোক তুজন আর কেউ নয়। একজন হচ্ছেন কর্মপুরুষ আর অন্যজন হলেন ভাগ্যপুরুষ। তাঁরা তুজনে কথাবার্তা বলে পথ চলেছেন ধীরে ধীরে।

ওঁরা কি বলছেন শুনবার জন্য সোমিলক একটু পা চালিয়ে ওদের খানিকটা কাছাকাছি এগিয়ে গেল। তারপর চলতে চলতে শুনতে পেল একজন অন্যজনকে বলছেন, "আচ্ছা ভাই কর্মপুরুষ, তুমি ঐ সোমিলককে এত মোহর দিলে কেন ? ওর মত স্বার্থপর লোকের এত ধন পাওয়ার অধিকার নেই।"

কর্মপুরুষ বললেন, "ভাই ভাগ্যপুরুষ, কর্মের পুরস্কার তো আমাকে দিতেই হবে। ভোগে আসা না আসা তার ভাগ্য।"

এঁদের কথায় সোমিলকের মুখ শুকিয়ে গেল। তার মনে হল, কে যেন তার থলের ভেতর থেকে মোহরগুলো বের করে নিচ্ছে। দুহাতে থলেটা চেপে ধরে সোমিলক চেঁচিয়ে উঠল, "চোর—চোর—।" তারপর থলেটা খুলে দেখে তাতে মোটে পঞ্চাশটা মোহর আছে, আর সব উধাও। হাহাকার করে কেঁদে উঠল সে।

তখন ভাগ্যপুরুষ তার সামনে এসে বললেন, "সোমিলক, অনর্থক কাঁদাকাটি করে মাথা খারাপ করছ কেন? মনে আছে প্রথম বার কি স্থির করেছিলে? যে-অর্থ তুমি নিজেও ভোগ করবে না বা দীন দুঃখীর উপকারেও লাগাবে না, সে ধনে তোমার কোন অধিকার নেই। তাই তো আমি তোমার মোহর সব কেড়ে নিলাম। এখন যা আছে তাই নিয়ে বাড়ি যাও, দুঃখ করো না।"

মিনতি করে সোমিলক বলল, "সবই ত বুঝলাম প্রভু, আমার কি তবে কোন কালেই দিন ফিরবে না?"

ভাগ্যপুরুষ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ফিরতে পারে। তুমি উজ্জয়িনী নগরে যাও, সেখানে গুপ্তধন আর উপভুক্তধন নামে দু'জন লোক আছে। তুমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা কর। তাহলেই তোমার দুঃখ দূর হবে।"

এই উপদেশ দিয়ে ভাগ্যপুরুষ কর্মপুরুষকে নিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। এদিকে সোমিলক করল কি, বাড়ি না গিয়ে সোজা চলে গেল উজ্জয়িনী নগরে। তারপর খুঁজে খুঁজে বের করল গুপ্তধনের বাড়ি। সন্ধ্যা তখন প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, এই সময়ে সোমিলক গিয়ে দেখা করল গুপ্তধনের সাথে।

এমন সময় বিদেশী দেখে গুপ্তধন ভারি বিরক্ত হল। ভুরু কুঁচকে

সে সোমিলককে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি, আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার কি লাভ ?"

করুণ কণ্ঠে সোমিলক বলল, "মহাশয়, আমি বিদেশী। পথ চলতে চলতে এখানে এসে রাত হয়ে গেছে। ক্ষুধা আর পথশ্রমে বড়ই কাতর। তাই আপনার কাছে এলাম একটু আশ্রয়ের আশায়।"

"ওসব আশ্রয়-টাশ্রয় হবে না আমার এখানে। তুমি অন্যত্র যাও।" দু' হাত তুলে উঠে দাঁড়াল গুপ্তধন। সোমিলক তবুও হাল ছাড়ে না, বলে, "শুধু রাতটুকু মাত্র থাকব। ভোর হলেই আর আপনাকে বিরক্ত করব না, একটু আশ্রয় দিন।"

এই সময় গুপ্তধনের স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন সেখানে এবং সব কথা শুনে বললেন, "রান্না-বান্না ত' আমাদের কখন হয়ে গেছে। এখন আবার তোমার জন্য রান্না চড়াব নাকি ? ওসব হবে না, তুমি বাপু অন্যত্র যাও।"

সোমিলক তবুও ছাড়ে না, জোড় হাতে বললে, "মা, দেখছেন তো আমার অবস্থা ? উঠতে পারছি না এখান থেকে। দয়া করে একটু শোবার স্থান আর যেমন তেমন একটু খাবার দিলেই আমি বর্তে যাই।"

গুপ্তধন দেখল লোকটা ত' কিছুতেই যাবে না। তখন বাধ্য হয়েই সে সোমিলককে আশ্রয় দিল। সেখানে সে খাবার পেল নুন আর পান্তাভাত। তার উপর গোয়াল ঘরের খড়ের গাদায় শুয়ে তাকে রাত কাটাতে হল।

খড়ের গাদায় শুয়ে শুয়ে সোমিলক ভাবতে লাগল গুপ্তধনের কথা। এত বড় ধনী লোক আর তার অন্তর এত ছোট, এত নীচ! যেমন কর্তা, গিন্নীও জুটেছেন তেমনি— একেবারে সোনায় সোহাগা। ভাবতে ভাবতে ভাবতে সোমিলক ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষরাত্রে হঠাৎ কান্নাকাটির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাই তো! হল কি এদের? তারপর খবর নিয়ে জানল যে, গুপ্তধনের স্ত্রী হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। বদ্যি এসে বহু চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই গিন্নীর জ্ঞান ফিরছে না। ব্যাপার দেখে সোমিলক আর রইল না সেখানে। ভোর হতে না হতেই সে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সেখান থেকে বেরিয়ে সোমিলক করল কি, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল উপভুক্তধনের বাড়িটা কোথায়। তারপর ঠিক সন্ধ্যার সময় গিয়ে উপস্থিত হল সেখানে। বাড়ির বাইরে বসে কি একটা কাজ করছিল উপভুক্তধন। সোমিলক গিয়ে আশ্রয় চাইতেই সে কাজ রেখে তাকে অভ্যর্থনা করল, "আসুন, আসুন, আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে সন্ধ্যার সময় বাড়িতে অতিথি এসেছেন। এই সময়ের অতিথিই শ্রেষ্ঠ। সকলের ভাগ্যে তা হয়ে ওঠে না।"

বলেই উপভুক্তধন সোমিলককে আদর করে নিয়ে বসাল ঘরের ভেতর, তারপর ছুটে চলে গেল তার স্ত্রীকে খবর দিতে।

ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোমিলক বুঝল যে, লোকটির অবস্থা খুব সুবিধার নয়। কোন রকমে দিন চলে মাত্র। কিন্তু অন্তরটি এর অতি মহান। গুপ্তধনের তুলনায় এ হচ্ছে স্বর্গের দেবতা। বসে বসে সে ভাবছে এইসব কথা। এমন সময় গিন্নী এসে দাঁড়াল তার কাছে। কি সুন্দর মূর্তি এই মেয়েটির! সাধারণ লাল পেড়ে শাড়ী তার পরণে। হাতে মাত্র দুগাছি শাঁখা আর আর কপালে সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী কি অন্নপূর্ণা এসে দাঁড়ালেন ঘরের মধ্যে।

গিন্নী এসেই সোমিলককে প্রথমে প্রণাম করলেন, তারপর জোড় হাতে বললেন, "আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, এমন সময়ে অতিথি

এলেন ঘরে। আমাদের অবস্থা ত' দেখছেন, আপনার সেবাতে অনেক ত্রুটি হবে, নিজ গুণে তা ক্ষমা করবেন।" বলেই তিনি চলে গেলেন



বাড়ির ভেতর। তারপর হাত পা ধোবার জল ও গামছা এনে দিয়ে চলে গেলেন রান্নার জোগাড় করতে।

কিছুক্ষণ পর উপভুক্তধন এসে বসলেন সোমিলকের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে চলল দুজনে কথাবার্তা। তারপর রান্না হয়ে গেলে সোমিলককে খাইয়ে-দাইয়ে কর্তা-গিন্নী শেষে আহার করলেন। বাইরের ঘরে সোমিলকের জন্য সুন্দর বিছানা দেওয়া হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর সে সেখানে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সোমিলক রওয়ানা হতে চাইলে কর্তা-গিন্নী জোড় হাতে বললেন, "কাল রাতে আপনার কিছুই খাওয়া হয়নি। আজকার দিনও আপনাকে থাকতে হবে। নইলে মনে বড় দুঃখ পাব।"

মৃদু হেসে সোমিলক বলল, "কাল রাত্রে যা খাওয়া আর বিশ্রাম

হয়েছে তার তুলনা হয় না। কোথাও আপনাদের কোন ত্রুটি হয়নি। আমি বরং অসময়ে এসে আপনাদের কষ্ট দিয়েছি।”

জিভ কেটে গিন্নী বলল, “ছিঃ, ছিঃ ওরকম কথা বলবেন না। এতে আমরা যে অপরাধী হব। আপনি বিশ্রাম করুন আমি আপনার জন্য জলখাবার তৈয়ার করে নিয়ে আসছি।” বলেই গিন্নী চলে গেলেন রান্না ঘরে। গিন্নী চলে যাওয়ার পরই হঠাৎ বাহির থেকে কে ডাকল, “কর্তা বাড়ি আছেন নাকি ?” সঙ্গে সঙ্গে উপভুক্তধন উত্তর দিল, “এই যে ভাই আসছি আমি, একটু দাঁড়াও।” বলেই সে বাইরে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বসে সোমিলক শুনল উপভুক্তধন ও আগন্তুকের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

আগন্তুক চড়া সুরে বলল, “মশাই, এরকম করে আর কতদিন চালাবেন বলুন। গরীব মানুষ গরীবের মতই থাকুন, তা নয় কেবল কেবল অতিথি সেবা, অতিথি সেবা। এদিকে যে বাকির অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে সেদিকে খেয়াল আছে ? আমার জিনিসের দাম আর কতকাল ফেলে রাখতে পারি বলুন তো। এরকম হলে আর আপনাকে জিনিস দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে যে—এটা মনে রাখবেন।”

লোকটার কথার উত্তরে উপভুক্তধন বললেন, “আস্তে কথা বল, ভাই। পাশের ঘরেই যে আমার অতিথিটি বসে আছেন। এসব কথা তাঁর কানে গেলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না।”

লোকটা বিরক্তিভরে বলল, “তা'বলে আমার জিনিসের দাম পাব পাব না ? আচ্ছা মজার কথা তো !”

উপভুক্তধন বললেন, “তা বটে, তোমার অনেক টাকা পাওনা হয়েছে। তা এক কাজ কর না ভাই, আমি তোমার কাছে আমার বসত ভিটাখানা বন্ধক রাখতে রাজী আছি। তাই নিয়ে তুমি শান্ত হও। আর গোলমাল করো না।”

ঐ সব কথা শুনে সোমিলকের ভারি লজ্জা হতে লাগল। মনে মনে ভাবল, আর এখানে থাকা নয়। থাকলে এদের ঋণের বোঝা বাড়বে বই কমবে না।

এই ভেবে সে চুপিসারে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। তারপর কর্তা-গিন্নীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সে জায়গা ছেড়ে।

চলেছে সোমিলক রাস্তা ধরে জোরে পা চালিয়ে এমন সময় একদল লোক এসে দাঁড়াল তার সামনে। লোকগুলির মাথায় মস্ত বড় এক একটা ঝুড়ি, তাতে চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি বোঝাই। লোকগুলোর মধ্য হতে একজন সোমিলককে জিজ্ঞাসা করল, "মশাই, উপভুক্তধনের বাড়িটি কোথায় বলতে পারেন ?"

সোমিলক আঙুল দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "তোমরা কোথা থেকে আসছ ?"

লোকটি বলল, "আমরা আসছি রাজবাড়ি থেকে। রাজ্যের সাধু লোকদের জন্য আমাদের রাজা মাসে মাসে কিছু সাহায্য পাঠিয়ে থাকেন। এ মাসের বরাদ্দ এই উপভুক্তধন মশাই পেয়েছেন।"

বলেই তারা চলে গেল উপভুক্তধনের বাড়ির দিকে। আর সোমিলক চলল তার পথে। খানিক পথ চলতেই কর্মপুরুষ আর ভাগ্যপুরুষ এসে দাঁড়ালেন তার সামনে।

ভাগ্যপুরুষ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সোমিলক, দু'জনের কাছে গিয়ে কিছু শিক্ষালাভ হল ?"

স্মিত হাস্যে সোমিলক বলল, "হ্যাঁ প্রভু, হয়েছে। যখের মত ধন জমিয়ে রাখার চেয়ে মিতব্যয়ী হয়ে দান-ধ্যান করাই ভাল।"

তখন ভাগ্যপুরুষ বললেন, "আচ্ছা এখন যদি তোমার হারানো অর্থ আবার ফিরে পাও তবে কি করবে ?"

সোমিলক বলল, "মিতব্যয়ী হয়ে নিজের ভরণপোষণ করব আর

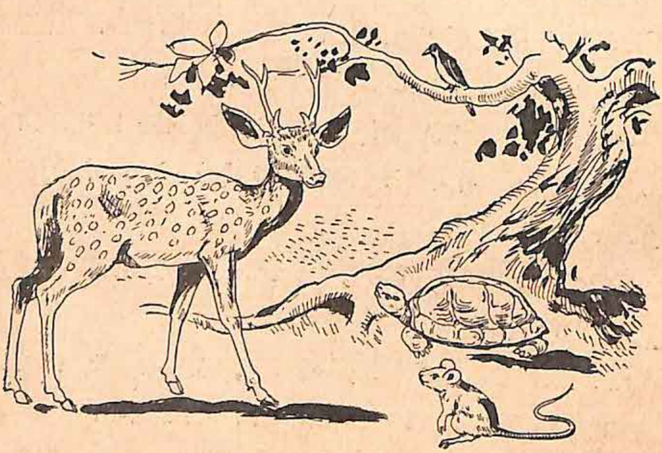
গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করব।"

হাসতে হাসতে ভাগ্যপুরুষ সোমিলকের সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তাই হোক। আশীর্বাদ করি সবাইকে সুখী করে নিজেও সুখী হও।"

বলেই দুজন অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর সোমিলক খুশি মনে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

গল্প শেষ করে মন্থরক বলল, "বন্ধু হিরণ্যক, তুমি ধনের জন্য অনর্থক দুঃখ করো না। শোন, ধনের তিন রকম গতি আছে—দান, ভোগ আর ক্ষতি। যে দান বা ভোগ কিছুই করে না, তার ধনের শেষ পরিণাম হয় ক্ষতি। এ জগতে দানের মত ধর্ম নেই, সন্তুষ্ট থাকার মত সুখ নেই।"

হিরণ্যক বলল, "বন্ধু, তোমার কথা শুনে মনটা শান্ত হল।" তার কথা শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে



এল একটা শৃঙ্গী হরিণ। এসেই হরিণটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল।

দেখে লঘুপতন বলল, "ভাই হরিণ, কি হয়েছে তোমার? এত হাঁফাচ্ছ যে?"

একটু দম নিয়ে হরিণ বলল, "আর বল কেন ভাই, শিকারীর দল যে ভাবে তাড়া করেছিল, বরাত জোরে কোন রকমে বেঁচে গেছি। নইলে আর উপায় ছিল না।"

গাছের মগডালে বসে কথা বলছিল লঘুপতন। ঘাড় উঁচু করে চারিদিক দেখে বলল, "সত্যি ভায়া, তোমার ভাগ্য খুবই ভাল। শিকারীরা কয়েকটা হরিণ মেরে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বন থেকে।'

এই কথা শুনে মন্থরক বললে, "যাক বাঁচা গেল। আজ থেকে আমরা চার বন্ধু হলাম। তোমার নামটা ত' জানা হল না বন্ধু, কি বলে তোমায় ডাকব?"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হরিণ বলল, "আমাকে চিত্রাঙ্গ বলেই ডেকো বন্ধু। তোমাদের ব্যবহারে যা আনন্দ হচ্ছে তা আর কি বলব।"

সেই থেকে তারা চার বন্ধুতে আছে বেশ মনের সুখে। এইভাবে দিন যায়। একদিন হল কি—চিত্রাঙ্গ চরতে গিয়ে এক শিকারীর জালে আট্‌কা পড়ল। তাদের মধ্যে নিয়ম ছিল, যে যেখানেই থাক না কেন, দুপুর বেলা সকলে বাসায় এসে একত্র হবে। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে যাবে খাবারের সন্ধানে। আর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলে বাসায় ফিরে আসবে।

এ দিন কিন্তু তা হতে পারল না। জালে আট্‌কা পড়ায় দুপুরে হরিণ আসতে পারল না। চিন্তিত মনে তিনজনে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমে দুপুর অতীত হয়ে গেল তবুও চিত্রাঙ্গের দেখা নাই। ভারি ভাবনায় পড়ল তিনজন। তারপর যুক্তি পরামর্শ করে স্থির হল লঘুপতন গিয়ে বন্ধুর খবর নিয়ে আসুক তার কি হয়েছে।

তাই হল। কাক উড়ে চলেছে নিচের দিকে লক্ষ্য রেখে। চলতে চলতে হঠাৎ সে দেখতে পেল বন্ধু চিত্রাঙ্গ এক শিকারীর জালে আটকা পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু কিছুতেই জাল থেকে বেরোতে পারছে না।

দেখেই লঘুপতনের চোখে জল এসে গেল। সে ধীরে ধীরে চিত্রাঙ্গের কাছে গিয়ে বলল, "এ কি করে হল বন্ধু, ভাল করে দেখে শুনে চলতে পার না ?"

লঘুপতনকে দেখে চিত্রাঙ্গ বলল, "তোমায় দেখে মনে বড়ই আনন্দ পেলাম, বন্ধু। যে ভাবে এই ফাঁদে আটকা পড়েছি, এ থেকে আমার মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। শিকারী এসে এখনি আমাকে মেরে ফেলবে। মৃত্যুকালে বন্ধুর মুখ যে দেখতে পেলাম এই আমার সান্ত্বনা।"

লঘুপতন বলল, "অমন কথা আর বলো না বন্ধু। ভয় নেই, আমি এখনি গিয়ে হিরণ্যককে নিয়ে আসছি। সে এই জাল কেটে তোমাকে মুক্ত করে দেবে।"

বিষাদ ভরা স্বরে চিত্রাঙ্গ বলল, "অনর্থক আর কষ্ট করে লাভ কি, বন্ধু ? ওতে হয়ত শেষে তোমরাও বিপদে পড়বে। তার চেয়ে বাসায় চলে যাও, আর বন্ধু হিরণ্যক ও মন্থরককে আমার ভালবাসা জানাও।"

এইভাবে দুজনে কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় হিরণ্যক এসে হাজির। এসেই ত তার চক্ষু স্থির! 'বন্ধু চিত্রাঙ্গ, এ কি করে হল ভাই ? তোমার দেরি দেখেই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তারপর বন্ধু লঘুপতনের দেরি দেখে নিজেও আর থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে পড়লাম তোমার খোঁজে। যাক আর ভয় নেই, আমি এখনি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।"

বলেই হিরণ্যক কচ্ কচ্ করে জাল কেটে চিত্রাঙ্গকে মুক্ত করে দিল। এই সময় বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মন্থরক। এসেই বলল, "তোমাদের বিলম্ব দেখে আমিও আর থাকতে পারলাম না। যাক, বন্ধু যে মুক্ত হয়েছে এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

মন্থরকের কথায় চিত্রাঙ্গ বলল, "ফাঁদে আটকা পড়ে কেবল তোমাদের কথাই ভাবছিলাম, বন্ধু। কিন্তু তোমার এভাবে আসা উচিত হয়নি। যদি এখন শিকারী এসে পড়ে তবে কি করবে? তুমি ত আমাদের মত ছুটে পালাতে পারবে না।"

বার কয়েক এদিক ওদিক দেখে নিয়ে হিরণ্যক বলল, "আর দেরি করা নয়, চল সব্বাই এখন সরে পড়ি। বন্ধু লঘুপতন, একবার উপরে উঠে দেখ ত' শিকারী আসছে কি না।"

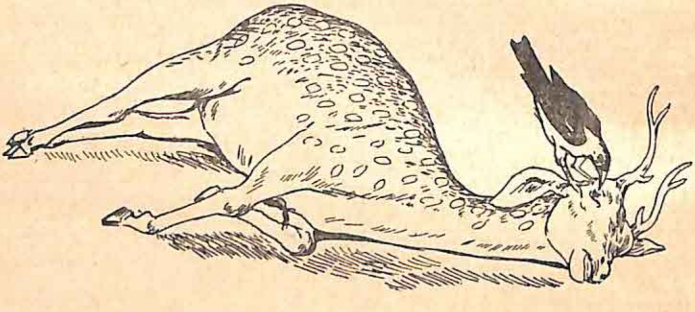
হিরণ্যকের কথায় লঘুপতন গিয়ে বসল এক মস্ত বড় গাছের মগডালে। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "যে যেদিকে পার পালাও, শিকারী আসছে।" বলতে না বলতেই একটা লোক ছুটে বেরিয়ে এলো বনবাদাড় ভেঙে। তাকে দেখেই হরিণ দে ছুট একেবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে, আর ইঁদুর গিয়ে লুকিয়ে রইল এক গর্তের ভেতর; কিন্তু বিপদ হল মন্থরকের। সে ত' আর ওদের মত ছুটতে পারে না। শিকারী এসেই দেখে হরিণটা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে, আর তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালীকচ্ছপ। দেখে সে মনে ভাবল, 'যাক, হরিণের বদলে একটা কচ্ছপ ত' পাওয়া গেল। এর মাংস বিক্রী করে দু-একদিন বেশ চলে যাবে।' এই ভেবে শিকারী মন্থরককে বেঁধে নিয়ে চলে গেল।

গাছের উপর বসে লঘুপতন দেখছিল সবই। বন্ধুর অবস্থা দেখে তার ভারি ভাবনা হল, কি করে ওকে রক্ষা করা যায়? এমন সময় চিত্রাঙ্গ আর হিরণ্যক ফিরে এল সেখানে। তিন বন্ধু মিলে যুক্তি আঁটতে লাগল কি করে মন্থরককে বাঁচানো যায়।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর লঘুপতন বলল, "হয়েছে, হয়েছে, তোমাদের আমি একটি ফন্দি বলে দিচ্ছি। সেই রকম চল দেখি। দেখবে আমাদের বন্ধুর বিপদ কেটে গেছে।" বলেই সে কাকে কি করতে হবে তা ভাল করে বুঝিয়ে দিল। তারপর আকাশের উপর উঠে দেখতে লাগল শিকারী কোথা দিয়ে যাচ্ছে। খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে লঘুপতন দেখল, শিকারী বেশি দূর যেতে পারেনি। মাত্র একটা টিলা পার হয়ে মস্ত বড় এক জলার ধার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

লঘুপতন বন্ধুদের তাড়াতাড়ি এগোতে বলে উড়ে চলল সেই দিকে। তারপর শিকারীকে পেছনে ফেলে গিয়ে বসল এক শিমুল গাছের মগডালে। জলার কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল সেই গাছটা।

এদিকে হল কি, বন্ধুর কথা মত চিত্রাঙ্গ আর হিরণ্যকও এসে হাজির হল সেখানে। এসেই আগের পরামর্শমত চিত্রাঙ্গ পেট ফুলিয়ে মড়ার মত পড়ে রইল গাছের নিচে। আর ইঁদুর লুকিয়ে রইল এক



ঝোপের মধ্যে। পরামর্শ মত কাজ হয়েছে দেখে কাক নেমে এল গাছ থেকে আর হরিণের মাথায় বসে বার বার তার চোখের উপর ঠোঁট ছোঁয়াতে লাগল, যেন সে হরিণটার চোখ তুলে আনবার চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণ পরে শিকারী এসে হাজির সেখানে—"বাঃ, হরিণটা তো তবে পালাতে পারেনি। এখানে এসে মরে পড়ে আছে। কি মজা, এক সঙ্গে দু-দুটো শিকার মিলে গেল।" বলেই কচ্ছপকে মাটিতে রেখে গেল হরিণটাকে তুলে আনতে। সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর এসে কচ্ছপের বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, "পালাও বন্ধু, শীগগির ঐ জলায় ঝাঁপিয়ে পড়।" বলেই ইঁদুর পালিয়ে গেল ঝোপের ভেতর, আর কচ্ছপ গিয়ে ডুব দিল জলার মধ্যে।

বন্ধু রক্ষা পেয়েছে দেখেই লঘুপতন কা-কা শব্দে উড়ে গেল আকাশে, আর হরিণ উঠে দে—ছুট, একেবারে গভীর বনে। হরিণটাকে এভাবে পালাতে দেখে শিকারীও হতভম্ব। তারপর ফিরে এসে দেখে কচ্ছপটাও নেই। নিষ্ফল আক্রোশে সে ওদের গালমন্দ দিতে দিতে চলে গেল সেখান থেকে।

শিকারী চলে গেলে পর চার বন্ধু এসে একত্র হল সেখানে। ওদের মনে আনন্দ আর ধরে না।

হাসতে হাসতে হিরণ্যক বলল, "বোকা শিকারীটাকে বেশ ঠকানো গেছে, কি বল তোমরা?"

শিং দুলিয়ে চিত্রাঙ্গ বলল, "তা আর বলতে? কিন্তু বন্ধু, তোমার বুদ্ধি বলেই এত সব হতে পারল। তোমাকে ধন্যবাদ।"

লঘুপতন বলল, "ধন্যবাদ কি কেবল আমার একার প্রাপ্য, বন্ধু? ধন্যবাদ দাও আমাদের খাঁটি বন্ধুত্বকে, আর একতাকে।" তারপর তারা বাসায় ফিরে গিয়ে মনের সুখে বসবাস করতে লাগল।





বিষ্ণুশর্মার লেখা 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে বহুদিন থেকেই। মহিলারৌপ্য নগরের রাজপুত্রদের শিক্ষার ভার নিয়ে বিষ্ণুশর্মা যেসব গল্প বলেছিলেন সেসব গল্পে পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গরাই হল প্রধান চরিত্র। ওই সব জনপ্রিয় গল্পগুলির কয়েকটি গল্প এখানে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী চমৎকার ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলেছেন ছোটদের জন্য।

ওরিয়েন্ট লংম্যান

Chakraborty : CHHOTODER PANCHATANTRA
ISBN 0 00121 027 0

Rs. 12.00